তরুণ লেখক প্রকল্প
বাংলা একাডেমি

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ

কালাম ফয়েজী

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ

কালাম ফয়েজী

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

www.pathagar.com

তরুণ লেখক প্রকল্প

বাএ ৩৬৫৮

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০৪/জুন ১৯৯৭। প্রকাশক : আসাদ চৌধুরী, পরিচালক, তরুণ লেখক প্রকল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কাইয়ুম চৌধুরী। প্রচ্ছদ চিত্র : মিলি চৌধুরী। মূল্য : ৫০.০০ টাকা।

ISBN 984-07-3667-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়
ডঃ আনিসুজ্জামান
বাংলা বিভাগ, ঢা. বি.
অধ্যাপক আসাদুজ্জামান
লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢা. বি.
যাঁদের কাছে আমার অনেক কৃতজ্ঞতা।

www.pathagar.com

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে —
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ।
আমার জীবন মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.pathagar.com

ভূমিকা : ১

বাংলাদেশের তরুণ লেখকের মননের দিগন্ত প্রসারিত করা তরুণ লেখক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত কম বয়সী তরুণ লেখকের বই বাংলা একাডেমীর প্রচলিত মানদণ্ডে প্রায়শ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। তাছাড়া আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তরুণ লেখকের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশের অভাব লক্ষণীয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন তরুণ লেখকের আত্মপ্রকাশের সুযোগ এখনও সীমিত। স্বভাবজাত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনার সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের অনেক তরুণ লেখককে নানা রকম লক্ষ্যরহিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। তরুণ লেখক প্রকল্পে এই তরুণদেরকে সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করার সুযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে কর্মমুখী জীবনের দিকে উৎসাহিত করা হয়। তাই তরুণ সাহিত্যিকদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে 'তরুণ লেখক প্রকল্প' একটি মান উন্নয়নমূলক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

তরুণ কথাসাহিত্যিক কালাম ফয়েজীর **পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ** শীর্ষক উপন্যাসটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

ড: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

www.pathagar.com

ভূমিকা : ২

তরুণ লেখক প্রকল্প সে-সব তরুণের জন্য যারা সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় ছয় মাসের মেয়াদের মধ্যে এদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, সাহিত্যের আঙ্গিক, কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা, দেশীয় সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের যোগাযোগ, নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যকর্মীর অভিজ্ঞতা বিনিময়, পড়ার ও লেখার আগ্রহ সঞ্চারের মাধ্যমে তাদের প্রতিভার লালন ও বিকাশের পথ সুগম করা — এ হচ্ছে লক্ষ্য। মুদ্রণ প্রযুক্তি সম্পর্কেও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাহিত্যচর্চাকে শৌখিনতার স্তর থেকে প্রফেশন্যাল পর্যায়ে উন্নীতকরণের সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হয়। এককথায়, সিরিয়াস লেখক হ'য়ে ওঠার ব্যাপারে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার প্রয়াস এই তরুণ লেখক প্রকল্প।

প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক তরুণ লেখকের একটি করে বই প্রকাশ করা হয় বাংলা একাডেমী থেকে। তরুণ কথাসাহিত্যিক কালাম ফয়েজীর **পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ** শীর্ষক উপন্যাসটি সেই নীতিরই বাস্তবায়ন।

আসাদ চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক
তরুণ লেখক প্রকল্প
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

www.pathagar.com

দু'টি কথা

আমার এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে দেশের নদীভাঙ্গা অসহায় ক'জন মানুষের জীবন নিয়ে। এরাই মূলত দেশের প্রকৃতজন। সমাজের সামান্য কিছু মানুষ সুবিধাভোগী, মুনাফাখোর। আর বিশাল জনগোষ্ঠী নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। আমরা যাদের সদা সর্বদা চোখের সামনে দেখি, সেই সাধারণদের উপজীব্য করে কাহিনী সাজানো এবং পাঠকমহলের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জটিল কাজ। এ জটিল বিষয় বস্তুকে যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এ কর্মে কতটা সফল হয়েছি তার বিচারের ভার রইল সম্মানিত পাঠক সমাজের উপর। তাদের সুচিন্তিত মতামত আমার শ্রমকে সার্থক করবে।

ঘটনা বর্ণনায় ভোলার দ্বীপাঞ্চলের কিছু আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। পাঠ করতে করতে আশা করি পাঠকবৃন্দ শব্দগুলোর অর্থ সহজে অনুমান করে নিতে পারবেন।

আমি নদীভাঙ্গা মানুষের কষ্টের করুণ দৃশ্য খুব কাছে থেকে দেখেছি। অনেক দিন থেকে পরিকল্পনা ছিল তাদের নিয়ে কিছু লিখব। এ কাহিনী লেখার পর নিজেকে খুব হালকা লাগছে। কাহিনী বর্ণনার উৎকর্ষ সাধনে যিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন সেই মান্যবর সাহিত্যিক জনাব আবুল হাসানাত সাহেবের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া এ উপন্যাস লেখার ব্যাপারে যারা নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা হলেন অধ্যাপক ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক মনসুর মুসা,কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি রফিক আজাদ, জনাব রশীদ হায়দার, জনাব হুমায়ূন রহমান, জনাব নৃপেন বিশ্বাস তাদের কাছে আমার গভীর শুকরিয়া।

প্রকল্পের মাননীয় পরিচালক জনাব কবি আসাদ চৌধুরী ও প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয়কারী সম্মানিত উপপরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীনের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

১১৬/১ অজিমপুর
ঢাকা – ১২০৫
ফোন – ৮৬৮৭৩৮

কালাম ফয়েজী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাত এগারটা পঁয়ত্রিশ। এর মধ্যেই মনে হয় সারা অঞ্চল ঘুমিয়ে পড়েছে। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস। কোন দিকে কোনপ্রকার সাড়া শব্দ নেই। মনে হয় মণি অমাবস্যার নিঝুম রাত। এত তাড়াতাড়ি গ্রামের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে ভাবতেই অবাক লাগে। রাশেদ ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকালো। অন্ধকারে ভালভাবে ঘড়ির কাঁটা চেনা যায় না। তবু সে চোখের কাছাকাছি নিয়ে দেখলো, রাত এখনো বারটা বাজেনি। নিজের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করার জন্য সে ঘড়িটিকে কানের কাছে নিল। তার কান জানান দিচ্ছে ঘড়িটি এখনো সচল আছে। সে নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করলো যে, তবু একটি সজীব কিছু তার সাথে আছে। এই নিস্তব্ধ রাতে, সুদূর অজপাড়া গাঁয়ে একটি ঘড়ি তার সাথী। ঘড়িটি ক্ষণে ক্ষণে তাকে জানিয়ে চলেছে — সে ভীরু ও নিঃসঙ্গ পথিকের এক মাত্র সঙ্গী।

রাশেদ নাগরপুর চৌরাস্তার মোড়ে এসে থামল। তার ধারণা ছিল আজ শুক্রবার। নাগরপুর হাট। হাটের শেষে নিশ্চয়ই দু' একটি দোকান খোলা থাকবে। একটি দোকানের সম্মুখে পাতা টুলে বসে চা-মুড়ি খাবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে দেখা গেল সারা চৌরাস্তার মোড়টা খাঁ খাঁ করছে। আগে যে পাঁচ/ছয়টি দোকান ছিল, যে দোকান কয়টিকে ঘিরে প্রতি শুক্রবার হাট বসতো সেই দোকানগুলি এখন নেই। বিশাল বট গাছের পাশে যে ছোট একটি দোকান আছে তারও ঝাঁপ ভাঙ্গা। এখানে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারে যতদূর চোখ গেল তার মধ্যে কোন জনমানুষের চিহ্ন দেখা গেল না। এতক্ষণ তার ভরসা ছিল — সামনে নাগরপুর। ওখানে পৌঁছে দু' একজন দোকানীর সাথে কথা বলে মন হালকা করবে, চা-পানি খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করবে। অথচ এখানে এসে তার গা ছমছম করে উঠল। দূরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে হল পথের দু'পাশে দু'পা ছড়িয়ে দৈত্যের মত কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। রাশেদের গা কাঁপতে শুরু করল।

রাশেদ এক কাঁধের ব্যাগটি আরেক কাঁধে নিল। জামার আস্তিন গুটিয়ে নিল। পা থেকে সেণ্ডেল খুলে হাতে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। প্রাণপণ হাঁটা।

নাগরপুর চৌরাস্তা থেকে কচুখালির খেয়া পর্যন্ত দুই মাইলের রাস্তা। গ্রামের দুই মাইল চার মাইলের সমান। এই পথটুকুর মধ্যে চার/পাঁচটি সাঁকো। দশ/বারটি ভাংতি। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। যেখানে রাস্তা ভাঙ্গা তার কোথাও হাটু পানি, কোথাও কোমর পানি। আগের দিনে লোকজন গামছা পরে হাটে আসতো। হাটে পৌঁছার পর খোলা লুঙ্গি আবার পরে নিত। পনের/ষোল বছর আগে মোজাম্মেল উকিল নামে এক অর্থশালী লোক এ রাস্তাটা বেঁধে দেয়ার উদ্যোগ নেন বটে কিন্তু তিনি কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তার প্রতিপক্ষ চাচাতো ভাই জাহাঙ্গীর উকিল কাজটি করতে দেয়নি। তার ধারণা ছিল

www.pathagar.com

মোজাম্মেল উকিল যদি এত বড় কাজ করে ফেলেন তাহলে জনগণ আজীবন তার কথাই বলবে। রাস্তাটার নাম হবে মোজাম্মেলের রাস্তা। এলাকার নেতৃত্বও চলে যাবে তার হাতে। তিনি এটা স্বজ্ঞানে হতে দিতে পারেন না। অথচ কাজটা তিনি নিজেও করছেন না। কারণ এত টাকা তার ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সরকারিভাবে কাজটা হোক। তাতে কাজও হল, তার কৃতিত্বও বজায় থাকল। এজন্য মোজাম্মেল উকিল যখন গ্রামবাসীদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন তখন জাহাঙ্গীর উকিল দু'চার জন রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিককে নিয়ে আদালতে কেস ঠুকে দিল। বেআইনীভাবে কৃষকদের ফসলী জমি নষ্ট করার জন্য মোজাম্মেল উকিলের এক বছরের জেল হল। তারপর পনের-ষোল বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেল, রাস্তার কাজটা আর শেষ হল না। নাগরপুর গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্টও আর গেল না। কিন্তু রাস্তাটার নামকরণ হয়ে গেল মোজাম্মেলের রাস্তা।

নাগরপুর চৌরাস্তা থেকে কচুখালীর খেয়া ঘাট পর্যন্ত পথটা একদম ফাঁকা। আশপাশে কোন বাড়িঘর নেই। পথের দু'ধারে বিস্তৃত জলাভূমি, যার নাম লেংডিয়ার বিল। আগে বর্ষাকালে থাকতো থৈ থৈ পানি। নৌকা ছাড়া লোকজনের যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। নাগরপুর হাটে যাওয়া ছাড়াও থানা সদরে যেতে হলে সবাইকে এই লেংডিয়ার বিল পেরিয়েই যেতে হতো। যে বছর রাশেদ চরফ্যাশন গিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় সে বছরও তাকে নৌকা যোগেই সদরে যেতে হয়েছিল, তার এক বছর পরেই নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়।

মাত্র সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে কতগুলি বছর অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই যে ষোল বছর আগে এবড়ো-থেবড়ো ভাবে একটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেই রাস্তা পরে আর কোনদিন মেরামত হয়নি। একবারের জন্যও সরকারের বড়চোখ এই ক্ষুদ্র রাস্তাটির উপর পড়েনি। ছোটকালে বোর্ডিং স্কুল থেকে মাঝে মাঝে বাড়ি আসার সময় রাশেদ মনে মনে ভাবতো কোনদিন বড় হলে সে এই রাস্তাটা পাকা করে দিবে। যেন চরকলমীর লোকজন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি আসতে পারে। তখন সদর থেকে বহু দূরের গ্রামে যেতেও যেন তাদের কোন যাতায়াতের কষ্ট না থাকে।

শরতের শেষাশেষি। এখনো বর্ষা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। যেখান দিয়ে মেঘ উঠে সেখানেই বৃষ্টি হয়। বর্ষার মত এসময়ে সারা আকাশ জুড়ে মেঘ থাকে না। মুষলধারে বৃষ্টি হয় না। আজও দেখা যাচ্ছে আকাশের সর্ব দক্ষিণে একফালি মেঘ ছাড়া সমস্ত আকাশ পরিষ্কার। সারা নভোমণ্ডল জুড়ে অগণিত তারার ছড়াছড়ি। যেন বাগানে ফুটে আছে অসংখ্য গোলাপ। সেই গোলাপের হাসিতে সমগ্র প্রকৃতি আনন্দে হৈ হৈ করছে।

রাশেদ প্রায় এক তৃতীয়াংশ পথ পেরিয়ে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল সাড়ে বারটা বাজে। নাগরপুর চৌরাস্তার মোড়টা ছিল অন্ধকার। বিশাল বটগাছ চারদিক ঢেকে রাখার কারণে মনে হচ্ছিল নিঝুম অমানিশা। অথচ এখন চারদিক কত ফর্সা! রাশেদ তিনটি ভাংতি ও দু'টি সাঁকো পেরিয়ে তৃতীয় সাঁকোর কাছে এসে দাঁড়ালো। এখানে আসতেই শাঁই করে তার মাথার উপর দিয়ে কি যেন একটা উড়ে গেল। সে হঠাৎ চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকালো। ভয় পেয়ে বুকে থুথু দিল। তার মনে হল — নিশ্বাস খুব দ্রুত উঠা নামা করছে।

www.pathagar.com

সাঁকোর দিকে তাকিয়ে দেখলো সাঁকোর তিনটি গাছের মধ্যখানের গাছটি নেই। অথচ ধরনাটা ঠিক স্থানে আছে। তার মনে হল – কিছুক্ষণ আগেও সাঁকোর মাঝের বাঁশটি যথাস্থানে ছিল। তার আগমন টের পেয়ে কেউ এটি সরিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ বাম দিকে লক্ষ্য করে দেখলো — ছরছর করে রাস্তা থেকে কি যেন ক্ষেতের দিকে নেমে যাচ্ছে। সে মনে মনে আয়াতুল কুরসী পড়তে শুরু করল। 'আল্লাহু লা–ইলাহা–ইল্লা–হুয়াল–হাইউল কাইউম — আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সর্বত্র বর্তমান।' লেংডিয়ার বিল অনেক বড় বিল। নদীর এক পাড়ে দাঁড়ালে যেমন অন্য পাড়ের গাছগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনে হয় ল্যাংডিয়ার বিলের মাঝখানে দাঁড়ালেও এমন লাগে। মনে হয় পথিক লোকালয় থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বিলের মধ্য দিয়ে মানুষের আনাগোনা কম বলে ভূত প্রেতের আড্ডা বেশি। একটা সময় ছিল যখন চরকলমীর লোকেরা সদরে যেতে চাইলে লেংডিয়ার বিলের মধ্য দিয়ে কয়েকটা ডিঙ্গি নৌকা একত্রিত করে একসঙ্গে যেতো। আবার রাতে ফেরার পথেও তারা হৈ হাই করে এক সাথেই ফিরতো। নির্জন নিস্তব্ধ এই বিলে তখন ভূত প্রেতের উপদ্রব যেমন ছিল, তেমনি ছিল ডাকাতের আড্ডাও। আজ বর্ষার এই রাতে ডাকাতের আস্তানা হয়ত নেই কিন্তু ভূত–প্রেতের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শিশু বয়সে সে তার দাদীর কাছে দাদা সম্পর্কে একটি গল্প শুনেছিল। দাদা তখন ছিলেন ভয়াবহ শক্তিশালী এক নওজুয়ান। খুব কম মানুষকেই তিনি কেয়ার করে চলতেন। আর ভূত প্রেতের ভয় ছিল তার কাছে ছেলে ভুলানো ছড়ার মত। এক শীতের রাতে তিনি সদর থেকে বাড়ির পথে একাই রওয়ানা হলেন। এক হাতে ছিল চারটি বড় বড় ইলিশ মাছ, অন্যহাতে তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। তিনি স্কুল সংক্রান্ত একটি কাজ করার জন্য গিয়েছিলেন সদরে। তখনও এই বিলের মধ্য দিয়ে কোন রাস্তা তৈরি হয়নি। শুকনো লোকজনের হাঁটা–চলায় বিলের মাঝখান দিয়ে যে ঢালা পথ তৈরি হত সেই পথ ধরেই লোকজন যাতায়াত করত। তিনিও সেই পথ ধরেই হেঁটে যাচ্ছিলেন। বিলের মাঝামাঝি যাবার পর তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। ফলে তিনি কেবল হাঁটছেন আর হাঁটছেন। কতদূর যাবার পর কে যেন বলল — এই এসহাক, তোর মাছ দিয়ে দে! তাহলে পথ পেয়ে যাবি। মাছ না দিলে আমার সাথে কুস্তি লড়তে হবে। কুস্তিতে জিতলে ভাল, না জিতলে মেরে ফেলব। দাদার সাথে সেই ভূতের কুস্তি হয়েছিল। দাদা জিতে ছিলেন বটে কিন্তু সে রাতে আর পথ খুঁজে পেলেন না। সারা রাত ধরে তিনি কেবল লেংডিয়ার বিলে পথ খুঁজে বেড়ালেন। আজ যদি সেই ভূত তাকেও কুস্তি লড়ার আহবান জানায় তাহলে কেমন হবে? দাদা পালোয়ান ছিলেন, অসুরের শক্তি ছিল তার গায়ে, অথচ রাশেদের কোন শক্তি নেই। যাদের শক্তি কম তাদের বুদ্ধিও কম। বলহীন ভীরু মানুষ অল্প বিপদেই খেই হারিয়ে ফেলে। রাশেদের ভয়ে হাত–পা কাঁপছে। সেও কি ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে?

রাশেদ ভাবল তার চিন্তা করার সময় নেই। তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা তো কালি বাড়ির শ্মশান ঘাট নয় যে, এক দৌড়ে স্থানটি অতিক্রম করলেই ঝামেলা চুকে গেল। এখানে দৌড় দেয়ার মত কোন ব্যবস্থাও নেই। দৌড় দিয়ে একজন মানুষের পক্ষে কতদূর যাওয়া সম্ভব? এটা একটা বিশাল বিস্তৃত বিল, দু'পাশে ফসলী জমি, বড় বড় ধান গাছ।

www.pathagar.com

দিনের বেলা হলে এই গাছাল ধান দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো। অথচ এখন আবছা অন্ধকারে ধান গাছের প্রাণকাড়া সবুজ দৃশ্যটা নজরে আসছে না। ধান গাছগুলি এখন প্রেতের মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কেউ যদি তাকে মেরে ধান গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখে, এই পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না তার মৃত্যুর কথা। কেবল ফসল কাটার সময় পঁচা হাড়-গোঁড় দেখে কিষাণদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যাবে। কেউ আফসোস করবে, কেউ জমির মালিককে খবর দিবে। দু' একদিন মানুষের মুখে বিষয়টি আলোচিত হবে। তারপর সবশেষ। রাশেদ নামের এক যুবকের অস্তিত্ব মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় মিলে যেতে পারে। পারে না? সমুদ্রে পড়া একজন মানুষ যেমন নিরুপায় তেমনি এখানেও সে ভয়ানক অসহায়। তার মনে হয় ভূতের সাথে মানুষের যে শত্রুতা সেই শত্রুতা উদ্ধারের জন্য যে কোন একটি ভূত তার গলা টিপে ধরলেই যথেষ্ট।

রাশেদের দাদা একজন অসীম শক্তিশালী লোক ছিলেন। অথচ তার শরীরে ছাগলের শক্তিও নেই। তবু সে ভাবল নদী শুকিয়ে গেলেও তার রেখাটা একেবারে মুছে যায় না। সে মনে মনে একটু সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল। লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। সে প্যান্ট সার্ট খুলে ব্যাগে নিল। ব্যাগ থেকে গামছা নিয়ে কাছা মেরে পরল। তার মনে হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন তার মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে দামোদর নদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন, তেমনি রাশেদও আজ লেংডিয়ার বিলের খালগুলি সাঁতরে পার হবে। সে ধীর পায়ে সাঁকোর পাশ ঘেঁষে খালের দিকে নেমে পড়ল। খালে নামতেই মনে হল — সাঁকোর মধ্যখানের গাছটি যথাস্থানে আছে। গাছের এক প্রান্তে সাদা কাপড় পরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সাদা কাপড়ে আবৃত লোকটি পুরুষ নয়, মহিলা। তার মাথায় ঘোমটা আছে। ঘোমটার কাপড় ফিনফিনে বাতাসে নড়ছে। রাশেদ দ্রুত সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সে একবার যখন খালে নেমেই পড়েছে তখন আর উঠবে না। সাঁকো থাকুক বা না থাকুক সে সাঁতরেই খালটা পার হবে। এ ধরনের ছোট খাট খাল বা নদী পার হওয়া তার জন্য কোন ঘটনাই নয়। সে সাঁতারে যথেষ্ট পারদর্শী। একবার স্কুলের সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। আজ কেবল ভয় হচ্ছে পরিবেশটা ভূতুড়ে বলে। দিনের বেলা হলে থোরাই কেয়ার করতো।

সে বাম হাতে ব্যাগ উঁচিয়ে ধরে ডান হাতে পানিতে চাপ প্রয়োগ করল। আবার ঠিক তখনই তার মাথার উপর দিয়ে কি যেন একটা উড়ে গেল, এবং কতগুলি পাখি কিচির-মিচির করে একসাথে ডেকে উঠল। মনে হলো তার চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেই অন্ধকারটা যেন তাকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে কোন দিকে না তাকিয়ে আরো দ্রুত দু'পা ও ডান হাত নাড়িয়ে খাল পার হওয়ার চেষ্টা করল। তার নিজের কাছে মনে হল একটি অপটু মুরগীর বাচ্চা যেমন নদীর অথৈ জল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণপণে কূলের দিকে ধাবিত হয় তেমনি সে-ও দ্রুত কূলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যতই সে কূলের দিকে যাচ্ছে পায়ের অজানা শিকল তাকে ততই খালের মাঝের দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ পরে কিনারার মাটি রাশেদের পা স্পর্শ করল, এবং সে দ্রুত পাড়ের উপরে উঠে গেল। তার ইচ্ছে হল পিছন দিকে একবার তাকায়। সাঁকোর উপর সাদা কাপড় পরিহিত সে মহিলা এখনো সেখানে আছে কিনা, নাকি তাকে ভয় দেখানোর জন্য অন্য আকৃতি ধারণ করেছে। মানুষ বহুরূপী হতে পারে কিন্তু খুব দ্রুত তার আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু ভূত সম্প্রদায় মুহূর্তের মধ্যে অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। আবার অদৃশ্য হয়ে তারা বিদ্যুতের মত ক্ষীপ্র গতিতে যে কোন স্থানে গমণও করতে পারে।

www.pathagar.com

এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভূতের চেয়ে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতি সহ্য করতে পারেনি। তাইতো প্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত মানুষের সাথে অঘোষিত শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে। এজন্য মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয় যাতে কোন অশুভ শক্তি তার ক্ষতি করে না ফেলে। আজ এই গভীর নিশীথে, নির্জন এই প্রান্তরে কী সতর্কতা আছে রাশেদের? কিভাবে সে রক্ষা করবে নিজেকে?

রাশেদ ঠিক করল — সে ভূত প্রেতের কথা কিছু ভাববে না। ভাবলেই ভয় বাড়ে। ভয় যত বাড়ে মানুষ তত দুর্বল হয়। সামান্য বিপদকেও তখন পাহাড়ের মত মনে হয়। লেংড়িয়ার বিলে একরাতে তার দাদা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন তাতে তার কিছুই হয়নি। সকাল দশটার মধ্যে তিনি যথারীতি বাড়ি পৌছে গিয়েছিলেন। আজ রাশেদেরও কিছু হবে না। অর্থহীন আজে বাজে চিন্তা করে মন নষ্ট করা। সে অতীতের কোন স্মরণীয় ঘটনা মনে করার চেষ্ট করল। তার অতি ক্ষুদ্র জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। প্রায় সব ঘটনাই বিষাদের। সে এখন দুঃখময় কোন ঘটনার কথা মনে করবে না। সে মনে করবে আনন্দময় কোন ঘটনার কথা। যেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার পথ শেষ হয়ে যাবে।

রাশেদের তখন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। রেডিওতে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে বটে কিন্তু সে তখনো তার রেজাল্ট জানতে পারেনি। একদিন সে তার দাদীকে বলল — আমার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তোমার অনুমতি পেলে সদর থেকে আমার ফলটা জেনে আসতে পারি। দাদী ছিলেন ভয়ানক অসুস্থ। তিনি রাশেদকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন — আমি দোয়া করি তোর ফল যাতে ভাল হয়, তোর জীবন আরো উন্নত হোক। রাশেদ বলল, দেখবে আমার ফল ভাল হবে। আর আমার ভাল ফলাফলের কথা জানলে তোমার অসুখও ভাল হয়ে যাবে। রাশেদ দাদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠল, কারণ তখন ছিল আষাঢ় মাস। চার দিকে পানি থৈ থৈ। তখন চরকলমীর লোকেদের সদরে যেতে হলে নাগরপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত নৌকায় তারপর পায়ে হেটে যেতে হতো। নাগরপুরে নৌকা থেকে নেমেই রাশেদ তার চমৎকার রেজাল্টের কথা জানতে পারল। তবু সে নিশ্চিত হবার জন্য সদরে গেল। স্কুল পর্যন্ত পৌছতেই তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হল। হেডস্যার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। কি লজ্জা! কি লজ্জা! আনন্দে তার চোখে পানি এসে গেল। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে আদর করলেন। লোকজন বলল রাশেদ চরফ্যাশন স্কুলের গৌরব। সারা ভাটি অঞ্চলে রাশেদই শ্রেষ্ঠ। হেডস্যার তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। দুইদিনে তার সেবার ত্রুটি হল না। মনে হল সদরের লোকজন সকলে তাকে একনজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। দু'দিন পর সে বাড়ি পৌছে দেখল তার দাদী ইহ জগতে আর নেই। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি রাশেদকে একনজর দেখার জন্য নাকি বার বার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাশেদকে না দেখেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সবশুনে তার চোখে পানি এসে গেল। রাশেদ ঠিক করেছিল এমুহূর্তে সে কোন রকম দুঃখের কথা ভাববে না। অথচ দাদীর মৃত্যুর কথাটা কোন ফাঁকে স্মরণে এসে গেল, যেন সে টেরই পায়নি।

রাশেদ পা চালিয়ে হাঁটছে। এর মধ্যে সে আরো একটি ভাংতি পেরিয়ে গেল। সামনে একটি ছোট আরেকটি ভাংতি। ভাংতির মধ্যে পানি কতটুকু কে জানে। চেষ্টা করলে হয়ত এটি এক লাফেও পেরুনো যায়। সে লাফ দিবে কিনা বুঝতে পারছেনা। হঠাৎ সে খেয়াল

www.pathagar.com

করে দেখলো — ভাংতির মধ্যে একটি টানা বর্শি। বর্শিতে কাতল মাছের মত এক বিরাট মাছ আটকে আছে। মাছটি কোন প্রকার নড়াচড়া করছে না। এটি কি তাহলে মৃত? কিন্তু এই বিলে রুই কাতল মাছ আসবে কোত্থেকে? এলেও এ ধরনের মাছ তো টানা বর্শি গিলার কথা নয়। তাহলে এটা কি সেই বুড়ি, যে সাদা কাপড় পরে সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে ছিল? হয়ত এখন অন্য আকৃতি ধারণ করে রাশেদকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। বুড়ির কথা মনে হতেই রাশেদের গায়ে কাঁটা দিল। তার মনে পড়ল শৈশবে কাজের ছেলে দুলুর কাছে শোনা একটি গল্পের কথা। গল্পটি এই ঃ

একবার কচুখালি গুদারা ঘাঁটের কালিগাছে ঝুলন্ত এক মহিলার লাশ পাওয়া গেল। কালিগাছটি ভাটি অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন গাছ। এর নীচে ফি বছর কালী পূজা হতো, পাঁঠা বলি দেয়া হতো। পূজার সময় গুদারা ঘাট জমজমাট থাকলেও অন্য সময় লোকজন তেমন থাকতো না। কালী গাছের সন্নিকটে দু'টি টং দোকান ছিল বটে কিন্তু সেগুলি সন্ধ্যার পরপরই বন্ধ হয়ে যেতো। অর্থাৎ খেয়া নৌকা যতক্ষণ চলতো দোকানও ততক্ষণ খোলা থাকতো। মাঝি চলে গেলে এখানে আর কেউ থাকতো না। এক সকালে মাঝি ঘাটের কাছে এসে দেখলো কালী গাছের সাথে এক মহিলার লাশ ঝুলে আছে। সাত সকালে সে এই দৃশ্য দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এবং দ্রুত আশপাশ থেকে লোজজনকে ডেকে আনলো। কাছাকাছি একটা জমিতে ক'জন চাষী জমি চাষ করছিল। তারাও ঝুলন্ত লাশের কথা শুনে দ্রুত চলে এলো। তখনও ছিল বর্ষাকাল। সদরে যাওয়া ছিল অনেক সময়ের ব্যাপার। এজন্য গ্রামের লোকজন পুলিশকে খবর না দিয়ে নিজেরাই লাশ নামিয়ে ফেললো। কিন্তু মহিলাটিকে কেউ চিনতে পারলো না

সে হিন্দু না মুসলমান সেটাও সনাক্ত করা গেল না। অবশেষে তাকে কবর দেয়া হল বটে কিন্তু কোন মৌলবী তার জানাজা পড়াতে রাজি হল না। দুলুর ধারণা সেই মহিলার মৃত্যুর পর থেকে এ অঞ্চলে ভূত প্রেতের উপদ্রব বেড়ে গেছে। আজ অমুকের সাথে দেখা হয়, কাল তমুকের দিকে ঢিল ছোঁড়ে। এক দুপুরে দেখা গেল — কালী গাছের কাছেই একটি বলশালী ষাঁড়ের মাথা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। একদিন জানা গেল — দুইজন লোকের সাথে সাদাশ্মশ্রু মণ্ডিত এক লোকের দেখা হয়েছে। লোকটি আনুমানিক দুই হাত লম্বা হলেও তার দাঁড়িগুলি মাটির সাথে লেগে আছে। নাগরপুরের বটগাছ থেকে কচুখালির গুদারা ঘাট পর্যন্ত ছিল সেই ভূতের আনা-গোনা। অসময়ে কেউ এই পথ দিয়ে হেঁটেছে তো তার ঘাড় মটকে দিয়েছে। মহিলার মৃত্যুর কিছু দিন পর একরাতে দুলু নাকি হারিকেন নিয়ে গুদারা ঘাটে গেল। পরে ফেরার পথে ঝড়-বাতাস ছাড়াই আপনা-আপনি তার হারিকেল নিভে গেল। তার বিশ্বাস এটা নিশ্চয়ই ঐ মহিলা ভূতের কাণ্ড।

রাশেদের মনে হল সাঁকোর উপর সাদা কাপড়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়োমত সেই মহিলাও আর কেউ নয়। সে ঐ কালি গাছে ঝুলন্ত অচেনা মহিলার প্রেতাত্মা।

আকাঙ্খার পরিধি যত বাড়ে কঠিন বিপদের জন্য তাকে তত প্রস্তুত থাকতে হয়। এই আরবী প্রবাদটির কথা ভেবে রাশেদ মনে একটু সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল। কিন্তু সে যত এগুচ্ছে তার পায়ের জোর যেন ততই কমে যাচ্ছে। অথচ বিধান হচ্ছে এই যে, একজন

www.pathagar.com

পথিক যতই পথ চলবে তার পথচলা ততই সহজ হবে। সে নিশ্চিত হবে যে, সামনে তার আর কোন বিপদ নেই। পরিশ্রম করলেই পারিশ্রমিক মিলে। পারিশ্রমিক মানে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন। কষ্ট করলে বিপদ আসবে এটা জানলে কারোই তো কষ্টের পথে পা বাড়াবার কথা নয়। অথচ রাশেদ জানে অনেক পথ সে পেরিয়ে এসেছে। সামনে কচুখালীর গুদারা ঘাট। খেয়া পার হওয়ার জন্য এত রাতে নিশ্চয়ই কোন নৌকা পাওয়া যাবে না। কচুখালীর যে বড় খাল বর্ষার দিনে সেটার স্রোত থাকে খরতর। সেই খরতর স্রোত পার হওয়া কোন ব্যাপার ছিল না যদি অশরীরি কোন প্রেতাত্মার উপদ্রব না থাকতো। কচুখালীর পরে একটা পাতাবন। সেটা পেরুলে আর সমস্যা নেই। পাতাবন পেরুলেই লোকালয়। রাস্তার কাছাকাছি বাড়ি ঘর। গ্রামের উত্তর দিকটা যদিও কিছুটা হিন্দু বসতি কিন্তু দক্ষিণ দিকে পুরোটাই মুসলমানদের বসবাস। পাতাবন সংলগ্ন যে শ্মশান ঘাঁট সেটা অতিক্রম করলে রাশেদ নিশ্চিত হতে পারবে যে, আজরাতের ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে সে অল্পের জন্য বেঁচে গেল। মনে হবে যেন এক ঝাঁক গুলি তার চুল স্পর্শ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

এতক্ষণ দক্ষিণ আকাশে যে একখণ্ড কাল মেঘ ছিল, সেটা ধীরে ধীরে প্রকাণ্ডরূপ নিচ্ছে। মনে হয় দিগন্তের দক্ষিণ প্রান্তজুড়ে এ এক কালো পাহাড়। হিমালয়ের চূড়ার চেয়ে এটা আরো গগণ স্পর্শী। পূর্বাকাশে এতক্ষণ একফালি সরুচাঁদ উঁকি দিচ্ছিল। রাশেদও মনে মনে চাঁদকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ তার চলার পথে আলো দরকার। অপরিমিত আলো। যেন তার জীবন থেকে সমস্ত ভয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। এখন ওই মেঘখন্ড এসে সরু চাঁদটিকে গ্রাস করেছে। মেঘের যা অবস্থা তাতে চাঁদের আলো সহসা ফুটে উঠবে বলে মনে হয় না। এতক্ষণ চারদিকে যে ফরসা আভাটা ছিল সেটাও এখন তিরোহিত। চারদিক আবার কালো আঁধারে ছেয়ে গেছে। মেঘের সাথে বাতাসের জোরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। অথচ মনে হয় বাতাস উত্তর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যেন ধূ-ধূ মরুভূমি অতিক্রমের সময় লু-হাওয়া যেন অসহায় পথিকের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

লেংডিয়ার বিলের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মনে হল এটা সেই বিল যেটা এক সময় পরিত্যক্ত ছিল। কৃষকরা বছরের এক সময় ধানের চাষ করলেও সারা বছর বিলটা পানিতে ডোবা থাকতো। স্বীয় উদ্যোগে কেউ মাছের চাষ করেনি বটে কিন্তু এই বিলে মাছের অভাব ছিল না। জেলেরা এসেছে আর যে যার ইচ্ছেমত মাছ ধরে নিয়ে গেছে। সরকারী পুকুরের মত এখানেও কারো ব্যক্তিগত আধিপত্য ছিল না। দেখতে দেখতে সেই সুন্দর দিন ফুরিয়ে গেল। ঝিল ভরাট হয়ে বিল হয়ে গেল। মানুষের মধ্যেও হিংসা হানাহানি শুরু হল। একবার শুরু হল লেংডিয়ার বিলের জমি দখল নিয়ে মারামারি। কেউ মরল কেউ বাঁচলো। কেউ জমি পেলো কেউ পেলো না। বিশেষ করে জমিদারদের জলমহাল হিসেবে ব্যবহৃত লেংডিয়ার বিল একসময় ছিল সাধারণ মানুষের মালিকানার বাইরে। আবার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাবার পর জনগণই এর অধিকারী হয়ে গেল। যারা সরকারের সাথে হাত করে নিজেদের নামে বন্দোবস্ত নিতে পেরেছে তারাই শেষ পর্যন্ত লেংডিয়ার বিলের মালিক হয়ে গেল। কত চাষী এলো গেল, কতজনের হাত বদল হল, কিন্তু বিল যে স্থানে ছিল, সেখানেই সে আগের মত পড়ে আছে। তার পাষাণ নিস্তব্ধতা সাক্ষ্য দিচ্ছে তার নিষ্ঠুর বুকে লুকিয়ে আছে কত হাসি কান্না, অগণিত খুন হওয়া মানুষের কত আর্তচীৎকার! জমিদার পোষা লাঠিয়ালদের দৌরাত্ম্যের দিন শেষ হলেও জুলুমরাজ জোৎদারদের অত্যাচারের দিন এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে পাহাড়ের মত কালো মেঘটি এখন সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। টলমল করে দু'এক ফোটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। এখনো রাশেদের পরনে গামছা। সাঁতরে একটি খাল পার হওয়ার আগে সে যে গামছা পরেছিল এখনো সেই ভিজা গামছা তার পরনে আছে। এতক্ষণ সে ওদিকে খেয়ালই করেনি। এখন ইচ্ছে হচ্ছে গামছাটা খুলে ফেলতে। পুরোপুরি নগ্ন হয়ে হাটলে কেমন লাগে একটু দেখা দরকার। জ্ঞান হওয়ার পর সে কখনো নগ্ন হয়নি। মানুষ সামাজিক প্রাণী। তাদের ইজ্জত আব্রু আছে। অন্যের কাছ থেকে সে নিজের গোপনীয় বিষয়গুলি ঢেকে রাখতে চায়। শত্রুর কাছে যেমন গুপ্ত তথ্য ফাঁস করা যায় না, তেমনি মানুষের সম্মুখেও পোষাক খুলে হাঁটা যায় না। যতদিন মানুষ কাপড় আবিষ্কার করতে পারেনি ততদিন তারা গাছের ছাল ও পাতা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতো। মানুষের সৌন্দর্য পোশাকের মধ্যেই।

আজ লেংডিয়ার বিলে কেউ নেই। এই নির্জন প্রান্তরে সে একাকী পথ চলছে। কারো কাছ থেকে নিজের গোপনীয়তাও ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে তো কেউ তাকে দেখছে না, সামাজিক আইনও ভঙ্গ হচ্ছে না। তার সারা শরীর উদোম। কেবল কোমরে এক চিলতে ভেজা গামছা। তারও কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। রাশেদ একটানে গামছাটা খুলে ফেলল। অমনি তার মনে হল কানের কাছে মহিলাকণ্ঠী কে যেন হি-হি করে হেসে উঠল।

এতক্ষণ পর রাশেদ আবার হঠাৎ চমকে উঠল। ভীরু দৃষ্টিতে সে চারদিকে তাকালো। তার মনে হল — পেছনে ছায়ার মত কি যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে দ্রুত গামছা পরে নিল। এবং কোন দিকে না তাকিয়ে আবার বেগে হাঁটতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টির সাথে সাথে দমকা বাতাস। সে যতই দক্ষিণ দিকে হাঁটার চেষ্টা করছে, ঝড়ো বাতাস তাকে ততই ঠেলে উত্তর দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ঘোর অন্ধকারে তার মনে হল — এটি বোধ হয় তার জীবনের শেষ সময়। বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রকৃতির হাতের সে একটি ক্রীড়নক মাত্র। চতুর বিড়াল যেমন ক্ষুদ্র একটি ইঁদুর শাবক নিয়ে খেলা করে এখন তেমনি নিষ্ঠুর নির্মম প্রকৃতিও তাকে নিয়ে খেলা করছে। সে নিশ্চিত, খেলা শেষ হলেই তার মৃত্যু অনিবার্য। রাশেদ আর এগুতে পারছে না। বৃষ্টির ফোটা তার খালি গায়ে কাঁটার মত বিঁধছে। শীতের প্রচণ্ডতায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তার পা ভারী হয়ে গেছে। সারা শরীর অবশ। সে বসে পড়ল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মনে হল তার সম্মুখে উঁচু দৈত্যের মত কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ে চীৎকার দিয়ে উঠল। তার মনে হল সে মরে যাচ্ছে। মৃত্যুর পূর্বে আজরাঈলকে দেখে কি এভাবে মানুষের পিলে চমকে উঠে? রাশেদ জ্ঞান হারালো না। কেউ সাহায্য করতেও এগিয়ে এলো না। তার চীৎকারের শব্দ নিজের কাছেই ফিরে এলো। মুহূর্তের মধ্যে পরপর দু'বার বিদ্যুৎ চমকালো। সে তাকিয়ে দেখলো সম্মুখে যে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে ছিল সেটা একটা গাছ। রাশেদের হাসি পেলো। নিজের অসহায়ত্ব নিজের কাছেই খুব খারাপ লাগলো। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ শ্মশানঘাটের কাছে শিমুল গাছে ভূতের বাচ্চার কান্না শুনেও ভয় পেয়েছিল। পরদিন এসে দেখলো শিমুল গাছে শকুনের বাচ্চা। ইন্দ্রনাথ নিশ্চিত হল গতরাত যা শুনেছিল সেটা ভূতের বাচ্চার কান্না নয়। এটা শকুনের বাচ্চার চিৎকার। রাশেদের মনে হল, সে যে ভয় পাচ্ছে এটা অমূলক।

www.pathagar.com

লেংডিয়ার বিলে এখন ভূতটুত বলে কিছু নেই। সে ভয় পেয়েছে বলেই এখানে পড়ে আছে। ভয় না পেলে সে এতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারতো। সে ওঠে দাঁড়ালো। এবং খুব স্বাভাবত ভঙ্গিতে পথ চলতে শুরু করল।

দুই

লেংডিয়ার বিল এমন একটা বিল যেখানে ফসলের দিনে প্রচুর ফসল, বর্ষার দিনে প্রচুর মাছ হয়। আর এ অঞ্চলে এমন কোন হতভাগ্য নেই, লেংডিয়ার বিলে যার এক কানি জমি নেই। এ বিল বছরের বড় একটা সময় পানিতে ডোবা থাকে বিধায় জমিগুলো এক ফসলী। জমিগুলো এত উর্বর যে মাজরা পোকার আক্রমণ না হলে ঔষধ বা সারের প্রয়োজনই হয় না। রাশেদদেরও এই বিলে জমি আছে। এক দরুণ জমি। শৈশবের এক শীতে ধান কাটার সময় রাশেদ এসেছিল জমি দেখতে। তাদের কাজের ছেলে দুলু তাকে ঘুরিয়ে দেখালো এটা তাদের জমি, এই খালের সীমানা থেকে ওই যে বৃন্দামুড়া দেখা যায়, এর পুরোটাই তাদের। আরেকবার রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে বলল — এইখান থেকে ঐ যে পাতাবন দেখা যায়, এর মধ্যে আর কারো পা রাখার জায়গা নেই। সে মনে মনে খুশীই হয়েছিল। কিষাণরা সারা দিন ধরে ধান কাটলো আর রাশেদ ঘুরে ঘুরে তাদের ধান কাটা দেখলো। তার মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা অথচ জীবন থেকে কতগুলো বছর পেরিয়ে গেল ! এর মধ্যে আর কোনদিন তার ঐ জমির কাছে যাওয়া হয়নি।

আজকের অন্ধকার রাতে, জীবনের চরম দুঃসময়ে তার খুব জানতে ইচ্ছে হল — কোনটা তাদের জমি? যদি কেউ তাকে চিনিয়ে দিত? রাস্তার পাশে থেকে পাতাবন পর্যন্ত তাদের যে বিস্তৃত জমি খণ্ড। রাশেদ যদি এখন সেই জমিটা চিনতে পারতো ! অন্তত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হলেও সে নিজ পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উপর দাঁড়িয়ে বলতে পারতো — আমার আর কোন আফসোস নেই। আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।

লেংডিয়ার বিল নিয়ে রাশেদের আর একটি স্মৃতি আছে। রাশেদ তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। এক জ্যৈষ্ঠ মাসে তার ফুফাতো ভাই সাদেক বেড়াতে এল। কোন এক দৈব কারণে সে বছর জ্যৈষ্ঠ মাসেই পানি উঠে গেল। পানির সাথে উঠল বোয়াল মাছ। ভাসান অঞ্চলের সব মানুষ সে বছর বোয়াল মাছ ধরতে গেল। এমন কি যে লোক কখনো মাছ ধরে না সেও সেই বছর শুধু দা দিয়ে কুপিয়ে দু'চারটা বোয়াল মাছ মারল। সে বছর স্কুল ঘরে পানি উঠে যাবার কারণে স্কুল বন্ধ ছিল ক'দিন। এক সকালে সাদেক বলল — চল রাশেদ, আজ আমরা লেংডিয়ার বিলে যাই।

: বিল খালে যেতে বারণ আছে। দাদী শুনলে তোমাকে বকবেন।

: নানীকে সামলানোর দায়িত্ব আমার। আমি যাচ্ছি তুই যাবি কিনা বল, গেলে চল, না গেলে থাক।

: কি ভাবে যাবে ?

www.pathagar.com

: ভেলা আছে। তোদের দুলু গতকাল কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়েছে, সেই ভেলা নিয়ে যাব।

: তুমি ভেলা বাইতে জান?

: উজান অঞ্চলের মানুষ। আর ভেলা বাইতে জানব না?

: আমি তো নৌকার বৈঠাও ধরতে জানি না।

: শিখে রাখতে হয়। সবই এক সময় কাজে লাগে। আমরা তো শহরের মানুষ না। নদীর পাড়ের মানুষ। দুই পাশে দুই নদী। এক পাশে মেঘনা আরেক পাশে তেতুলিয়া। মেঘনার চেয়ে তেতুলিয়ার ভাঙ্গন বেশি। একদিন চর কলমী ভেঙ্গে যাবে। সাঁতার না জানলে সেদিন ডুবে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।

: ভাইয়া তুমি আমাকে সাঁতার শেখাবে?

: অবশ্যই শিখাব। তবে কোন কিছু শিখতে হলে নিজের আগ্রহ বেশি থাকতে হয়।

: আমার আগ্রহ ঠিকই আছে। কিন্তু দাদী যে আমাকে কোথাও যেতে দেন না!

: রাশেদ, এক সময় তোমার দাদীও থাকবে না। কারো আঁচলে মুখ ঢাকার ব্যবস্থাও থাকবে না, সেদিনও তোমাকে বাঁচতে হবে। নিজের শক্তির জোরেই বাঁচতে হবে।

: তাহলে চল, তাড়াতাড়ি চল।

সাদেক এবং রাশেদ দু'মামাতো ফুফাতো ভাই বের হল। ভেলার তুলনায় লগি ছিল বেশ লম্বা। যেন পুরো বাঁশটাকেই লগি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাদেক বলল — দুলুর কাণ্ডটা দেখ — এক হাত ভেলা তিন হাত লগি। বেটা কমআক্কেল কোথাকার! কিন্তু শেষকালে এই লম্বা লগিতেও কাজ হল না। যখন ভেলাটা কচুখালিতে এসে গেল তখন গভীর ও খরস্রোতা খালে সেটা মাটি পর্যন্ত স্পর্শ করল না। উজানের দিকে স্রোত এত বেশি ছিল যে, কিছুতেই সাদেক ভেলা আটকে রাখতে পারছিল না। অবস্থা বেগতিক দেখে সে লগিকে বৈঠা হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করলো। তাতেও কোন ফল হল না। ভাগ্য ভালো যে কাছাকাছি একটি জেলে-নৌকা ছিল। নতুবা তাদের হয়ত যুগিরঘোল পর্যন্ত ভেসে যেতে হতো।

এতেও সাদেকের আক্কেল হল না। সে বলল — লেংডিয়ার বিলে যাবার নিয়ত করেছি। সামান্য বিপদ দেখে ফিরে যাব কেন। সেখানে গিয়ে মাছ ধরা দেখব। লোকরা খলফা চেপে ; দা দিয়ে কুপিয়ে মাছ ধরে। জ্যৈষ্ঠ মাসে উজাইন্না বোয়াল না দেখে ঘরে ফিরা ঠিক হবে না।

সেদিন বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকাশ জোড়া মেঘ থাকায় পরিবেশটা ছিল অনেকটা গুমোট। সারা বিলে ছিল ছিটেফোটা দুই চারজন মানুষ। তবু রাশেদরা দুপুর পর্যন্ত বিলে ঘুরাঘুরি করল। ভেলা দিয়ে একবার এদিক, আবার ওদিক গেল। কিন্তু কোথাও তারা একটি বোয়াল মাছের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলো না।

সাদেক রাশেদের তুলানায় বয়সে অনেক বড় হলেও দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। সাদেকের বাড়ি পাশের গ্রামে, গ্রাম বলতে আলাদা এক চর। চরের নাম চর মনোহর। পড়াশোনার দৌড় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকায় লেখাপড়া আর হয়নি। কাজ না থাকলেও

www.pathagar.com

অকাজের পণ্ডিত। বাবা মা যদি কোন কাজের চাপ দেন অমনি সে নানা বাড়ি চলে আসে। এখানে রাশেদ থাকায় তার সব পাণ্ডিত্ব রাশেদের উপর প্রয়োগ করে। বউছি খেলা, ঘুড়ি উড়ানো থেকে শুরু করে গাছের ফল চুরি পর্যন্ত সবই সে রাশেদকে হাতে কলমে শিখিয়েছে।

রাশেদ কচুখালির কাছাকাছি চলে এলো। তার এতক্ষণ ধারণা ছিল কুচুখালীর যে প্রশস্ত খাল এটি নিশ্চয়ই সাঁতরে পার হতে হবে। কারণ, এতরাতে খেয়ামাঝির টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ কাছাকাছি আসার পর মনে হল — কচুখালীর খেয়া আর নেই। এখানে বাঁধ দেয়া হয়েছে। করালগ্রাসী তেতুলিয়ার ছোবল থেকে রক্ষার জন্য চরকলমীর পাশ ঘেঁষে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সাইড ভেড়ির সীমানা পড়েছে কচুখালীর আরেকটু পশ্চিম পাশ দিয়ে যুগিরঘোল বরাবর। আগে যে স্থানে এসে পানি চক্কর দিয়ে মোড় খেয়ে অন্যদিকে ধাবিত হতো সেই ভয়াবহ যুগির ঘোলের উপর এখন স্লুইস গেইট। গেইট দিয়ে এখন উজানের পানি নামতে পারে কিন্তু নদীর পানি উঠতে পারে না।

রাশেদ তিন বছর পর গ্রামে এলো। সে সর্ব শেষবার যখন বাড়ি থেকে বিদায় হয় তখন সাইড ভেড়ির কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। প্রথম তার ধারণা ছিল ভেড়িটা তাদের বাড়ির পশ্চিম পাশ দিয়ে যাবে। তাতে তাদের বাড়ি, মসজিদ ও কবরস্থান রক্ষা পাবে। তাছাড়া গ্রামের রাস্তাটাও ছিল সেই বরাবর। কিন্তু ভেড়ি সোজা করার সময় তাদের বাড়িটা বাঁধের বাইরে পড়ে গেল। এজন্য সে অনুশোচনাও করেছিল। এতদিন পর সে গ্রামে এলো বটে কিন্তু সঠিক পথে আসতে পারলো না। তার দাদাকে লেংডিয়ার বিলের মাঝামাঝি পৌছার পর দিয়াভুলা পেয়েছিল। তিনি পথ হারিয়ে সারারাত বিলময় হেঁটেছেন। অথচ রাশেদকে দিয়াভুলা পেয়েছে অনেক আগে, লঞ্চ থেকে নামার সাথে সাথে। নতুবা কেন তার সাইড ভেড়ির কথা একবারও মনে হয়নি। গতকাল বিকেল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত আট/দশ ঘণ্টা সময় কেটেছে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। একটি ভয়াবহ বিপদ অতিক্রম করে এসেছে অথচ সময়মত যদি এত প্রশস্ত ভেড়ি বাঁধের কথাটা তার মনে পড়তো, তাহলে কি আর এত কষ্ট হতো ! ভেড়িটা যদিও ঘুরপথ, তবু এই রাতের অন্ধকারে সে নির্ভয়ে ভেড়ির উপর দিয়ে হেঁটে আসতে পারতো।

ভেড়ির উপর দিয়ে লোক চলাচল বেশি। ভেড়ির পাশে নদীভাঙ্গা লোকদের ছোট ছোট ঘর। মানুষের বসবাস যেখানে, সে লোকালয়ে তো ভূতপ্রেতের উপদ্রব থাকার প্রশ্নই উঠে না। অসংখ্য মানুষের কাছে একটি ভূত একেবারেই শক্তিহীন। তাছাড়া ভূতের নিজেরও তো জীবন-মৃত্যুর সমস্যা থাকতে পারে।

কচুখালি আসার পর দেখা গেল সারা আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এতক্ষণ যে আসমান জুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা ছিল তার লেশমাত্র নেই। কিছুক্ষণ আগে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল, আকাশের সহস্র তারা দেখে এখন সেটা বুঝারও উপায় নেই। প্রকৃতির বিচিত্র খেলা। কখন তার মনে কি চায় বুঝার সাধ্য নেই। কচুখালীতে যে বিখ্যাত কালিগাছ ছিল তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল গাছটা আগের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে গেছে। তার যে বিস্তৃত ডালপালা ছিল সেগুলি কেটে ফেলা হয়েছে। কালিগাছ সংলগ্ন খালের মধ্যে পাশাপাশি

www.pathagar.com

তিনচারটি নৌকা দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হল — একটি নৌকার গুলুই এর উপর কেউ একজন বসে আছে। রাশেদ কাছকাছি আসতেই নৌকার লোকটি বলল —

: কেডা? কেডা যাইতাছে?

: আমি।

: আমি কেডা?

: আমি রাশেদ।

: রাশেদ আবার কে?

: আমি মাতাব্বর বাড়ির রাশেদ।

: বাপের নাম কি?

: বাপের নাম দেলোয়ার হোসেন।

: তোমার দাদার নাম কি?

: দাদার নাম এছাহাক মাতাব্বর।

প্রশ্ন করতে করতে লোকটি নৌকা ছেড়ে উপরে উঠে এলো। রাশেদের কাছাকাছি এসে বলল — তুমি কি সত্যই দেলোয়ারের ছেলে? রাশেদ বলল — জ্বি। অমনি লোকটি রাশেদকে জড়িয়ে ধরলো। বললো — বাবা, তুমি বেঁচে আছো! তোমাকে কতদিন দেখিনি! মাঝে মাঝে খোঁজ করার জন্য তোমাদের বাড়ি যাই। যতবার গেছি ততবারই শুনেছি — তুমি নেই। বেঁচে আছো কিনা তাও কেউ জানে না। চিঠিপত্র দেয়া হয়েছে, উত্তর আসেনি। তুমি কি বাবা আমাকে চিনতে পেরেছো।

: চেহারা তো চেনা লাগছে।

: আমার নাম রফিকুল ইসলাম। তোমার বাবার বন্ধু।

: আপনি রফিক চাচা — বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল রাশেদ।

: হ্যাঁ আমি রফিক।

: এত রাতে আপনি এখানে কি করছেন?

: আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি এতরাতে এলে কোত্থেকে?

: ঢাকা থেকে এসেছি।

: কোন পথ দিয়ে এসেছো?

: লেংডিয়ার বিল দিয়ে এসেছি।

: ওরে বাবা! বল কি! পথে কোন সমস্যা হয়নি তো?

: নাহ! পুরুষ মানুষ, কি আর সমস্যা — রাশেদ হাসতে হাসতে বলল।

: তোমার পরনে গামছা কেন?

: বিলের মধ্যে বৃষ্টি নেমেছিল। বৃষ্টির লক্ষণ দেখে জামা প্যান্ট ব্যাগের মধ্যে রেখেছি। আমার পরনে যে গামছা সেটা এতক্ষণ মনেই হয়নি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি পোশাক পাল্টে নেই।

www.pathagar.com

রাশেদ ব্যাগের চেইন টান দিয়ে অবাক হয়ে গেল। ব্যাগের মধ্যে কোন ফাঁকে পানি ঢুকেছে সে টেরই পায়নি। এতক্ষণে তার মনে পড়ল একটা খাল সাঁতরে পার হওয়ার সময় ব্যাগটা হাত থেকে ছুঁটে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তার মাথায় অন্য চিন্তা থাকায় ব্যাগে পানি ঢুকেছে কিনা সেদিকে খেয়ালই পড়েনি। এছাড়া প্রবল বৃষ্টির সময় সে দু'বার আছাড় খেয়েছিল। একবার তো পা পিছলে ভাংতির মধ্যেই পড়ে গিয়েছিল। হয়ত তখনও ব্যাগের মধ্যে পানি ঢুকে যেতে পারে। রাশেদ তবুও দ্রুত ভিজা প্যান্ট-শার্ট পরে নিল। কাত করে ব্যাগের পানিটুকুও ফেলে দিল। রফিক চাচা এতক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাশেদ তাকে বুঝতে দিল না যে তার জামা-কাপড় একেবারে জবজবা। সে রফিক মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো — চলুন রফিক চাচা, আমি তৈরি। রফিক মিয়া বললেন — আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেই — তুমি কি নৌকা দিয়ে সোজা ওপার চলে যাবে, নাকি একটু ঘুরে বাঁধের উপর দিয়ে যাবে? রাশেদ বলল — বাঁধের উপর দিয়েই যাব। অনেকদিন গ্রামে আসি না। পায়ে হেঁটে নিজগ্রামের অবস্থা দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরব।

: বাড়ি থাকলে তো যাবে!

: কেন, বাড়ির কি হয়েছে?

: বাড়িটা এখনো ঠিক আছে। তবে মসজিদ ও কবরস্থান ভেঙ্গে গেছে। গত মঙ্গলবার দেখলাম — মসজিদের সামান্য অংশ বাকি আছে, গতকাল লোকজন বলাবলি করছিল যে চরকলমীর সর্বপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্নটিও বিলীন হয়ে গেছে।

: বাড়ির ঘর-দরজা কি এখনো ঠিক আছে?

: তোমাদেরটা এখনো ঠিক আছে। মফিজ উদ্দিন ও কাদেরভাই দুইজনেই তাদের ঘর ভেঙ্গে নিয়ে গেছে।

: ওরা কোথায় গেছে?

: ওরা আরো দক্ষিণে লেতরা বাজারের কাছাকাছি বাড়ি করেছে। অন্যরাও যাই যাই করছে। কিন্তু কে কোথায় যাবে সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে।

: চাচা আপনার খবর কি? আপনাদের বাড়ি ঠিক আছে তো?

: আরে না! আমার ঘরতো কত আগেই ভেঙ্গে গেছে। আমাদের বাড়িটা যেখানে ছিল সেই স্থানটি এখন মাঝ-নদী।

: চাচা আপনাদের এত জমি জিরাত ছিল .... !

: সবই এখন গাঙের মধ্যে। এইসব নিয়ে এখন আর ভাবি না। ভাবলেই হু হু করে কান্না আসে।

: এখন থাকেন কোথায়?

: আর থাকন! ভেড়ির পাশে ঘর তুলেছি, অগণিত নদীভাঙ্গা মানুষের মত আমরাও ঘর-দরজাহীন ওরকাইত। ছোটকালে এক রাজার কাহিনী শুনেছিলাম, যিনি সকালে ছিলেন রাজা আর সন্ধ্যায় হলেন পথের কাঙাল। আমাদের অবস্থাও আজ সেই রকমই। জন্মভূমির সাথে মানুষের একটা নাড়ীর সম্পর্ক থাকে শুনেছি। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক তারা প্রাণপণে মূলের কাছে ফিরে আসতে চায়। আমাদের সেই মূল, সেই শিকড় এখন আর নেই।

www.pathagar.com

: সংসার চলে কিভাবে?

: গেল বছর একটা ছান্দি নৌকা দাদন নিয়েছিলাম। সবাই নৌকা-জাল দাদন নিয়ে ইলিশ মাছ ধরে। আমারও মাছ ধরার ইচ্ছে হল। সারা বর্ষা খুব কষ্ট করলাম। অল্পের জন্য একবার ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। এত ঝুঁকি নিয়েও যে পরিমাণ মাছ মারার দরকার ছিল, সে পরিমাণ মারা গেল না। শেষমেষ মহাজনের সুদসহ দাদন পরিশোধ করতে অনেক টাকা ঋণ করে ফেললাম। এবারও নাও কেরায়া নেয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গত বছরের বাকি টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এবার তাও পাওয়া গেল না। এই বছর অন্যের নৌকায় কাজ করি। বর্ষার তিন মাসে ছয় হাজার টাকা দিবে।

: এতরাত জেগে আপনি কি সেই নৌকা পাহারা দিচ্ছিলেন?

: হ্যাঁ।

: এখন তো আপনি নায়ে নেই। আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ যদি নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায়?

: পালাবে না, আমার উপর এত ধারালো খড়্গ কেউ চালাবে না। যদিও অন্যের নৌকায় কাজ করি। তবু লোকজন দাম দেয়। তাছাড়া কখনো তো কারো ক্ষতিটতি করিনি।

: এখন শেষ রাত আপনার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার কথা। অথচ আপনি জেগে আছেন।

: জেগে আছি বলেই তো তোমার দেখা পেলাম। ঘুমিয়ে থাকলে কি তোমার দর্শন থেকে বঞ্চিত হতাম না?

: চাচা, আপনি কিন্তু আমার কথাটার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আপনি নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে শুয়ে ছিলেন, অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে থেকে দেখলেন ঘুম আসছে না। তখন গলুইএর উপর উঠে বসে আছেন। হয়ত সকাল পর্যন্ত এভাবেই বসে থাকতেন। আর এভাবে জেগে থাকতে থাকতে মনে হয় আপনার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গেছে।

রফিক মিয়া রাশেদকে ইশারা করে বললেন — দেখেছো রাশেদ, কেমন চাঁদ উঠেছে। এতক্ষণ মেঘ থাকায় মনেই হয়নি যে, চাঁদ এত উপরে উঠেছে। মেঘ কেটে যাওয়াতে চাঁদটাকে কত সুন্দর লাগছে। গাছের উপর দিয়ে এখন একে ঈদের চাঁদের মত লাগছে। এক মাস রোজা রাখার পর এক সন্ধ্যায় ঈদের সরু চাঁদ দেখে যেমন সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তেমনি তোমাকে দেখেও আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে হয় এমন কিছু পাবার জন্যই আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। রাশেদ ও রফিক মিয়া দু'জনে হাটতে হাটতে চরকালমী বাজারে এসে পড়ল। প্রশস্ত এই ভেড়ি বাঁধের দু'পাশে বেশ কয়টা দোকান ঘর। বাঁধের এক দিকে তেতুলিয়া নদী অপর দিকে কচুখালির প্রশস্ত খাল। ভেড়িবাঁধ বেশ উঁচু। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে পাশের দিকে তাকালে মনে হয় পাঁচ/ছয় তলা বিল্ডিং এর ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। উপরের এই দোকানগুলিকে দূর থেকে মনে হয় শূন্যে ভাসমান কয়েকটা উড়ো জাহাজ। রফিক মিয়া জানালেন — এখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। ছান্দি নৌকার মাঝিরা এই বাজারের প্রধান ক্রেতা। তিন/চারটা মহাজনী ঘরও আছে। তাদের কেউ সুদের উপর টাকা লাগায়, কেউ নৌকা জাল দাদন দেয়। মাছের ব্যবসাও এখানে জমজমাট।

www.pathagar.com

কাছাকাছি একটা বরফের কল থাকায় ভেড়ির পাড়ের বাজারটা বেশ চলছে। রফিক মিয়া কথায় কথায় আরো জানালেন, এই হাঁটটা চালু হবার পর থেকে নাগরপুরের হাঁট একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এই এলাকার লোকজন এখন আর নাগরপুর একেবারেই যায় না। কাপড়-জুতার দোকান হওয়াতে চরকলমীর অধিবাসীরা এখন সদরেও যাওয়ার তেমন দরকার মনে করে না। সমস্যা হল নদী ভাঙ্গন এখনো অব্যাহত আছে। তবে ভাঙ্গনটা আগের মত খরতর নয়। সে রকম থাকলে কত আগেই তো এই ভেড়িবাঁধ ভেঙ্গে যাবার কথা।

রফিক মিয়া ও রাশেদ ভেড়িবাঁধ ধরে দক্ষিণ দিকে কতক্ষণ হাঁটলেন। ভেড়িবাঁধের পাশে সারি সারি কুড়ে ঘর। রফিক মিয়া জানালেন — এরা সকলেই নদী ভাঙ্গা মানুষ। এক সময় এদের অনেকের অবস্থা ভাল ছিল। জমি ছিল, হালের বলদ ছিল। এখন নদীর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে সকলেই সর্বস্বান্ত, সবাই ওরকাইত। ভেড়ি বাঁধটা হয়েছিল বলে রক্ষা। লোকজন এসে ভেড়ির পাশে সরকারী জায়গায় এসে কোনমতে আশ্রয় নিয়েছে।

একস্থানে এসে রফিক মিয়া বললেন — রাশেদ, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি দু'মিনিটের জন্য একটু আসি। এই বলেই তিনি বাঁধ থেকে পাশের দিকে নামলেন। একটা ছোট ঘরের কাছে গিয়ে কাউকে যেন ডাকতে থাকলেন — ইয়ানূরের মা, ও ইয়ানূরের মা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো। ও ইয়ানূরের মা, একটু চেরাগটা ধরাও, দেখো কে এসেছে। উঠে দেখো, আকাশের চাঁদ ধরে এনেছি।

রফিক মিয়া আবার রাশেদের কাছে এলেন। বললেন — এটা আমার ঘর। করাল গ্রাসী তেতুলিয়া সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তবু মানুষ তো একেবারে পাখির মত বনে জঙ্গলে থাকতে পারে না। যখন থেকে সভ্য হয়েছ তখন থেকেই মানুষ খাবার রান্না করে খেতে শিখেছে। ঘর বানিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে শুরু করেছে। আমরাও এই ডেরার মধ্যে কোন মতে কালাতিপাত করছি। তুমি আজ রাতের বাকি অংশটুকু এখানেই থাকবে। খাবার মত কিছু থাকলে তাও খাবে।

খাবারের কথা শুনতেই রাশেদের পেটে ক্ষুধা মোচড় দিয়ে উঠল। সে দুই বেলার উপবাসী। ঘোষের হাটে সে যখন লঞ্চ থেকে নেমেছিল তখন ভেবেছিল একটা হোটেলে ঢুকে চারটা খেয়ে নিবে। আবার ভাবলো সে এক সঙ্গে বাড়ি গিয়েই খাবে। সামনে অন্ধকার রাত। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছা যায় ততই মঙ্গল। সে মূলত বাড়ি পৌছতে পারেনি। এমন কি পথেই তার রাত কেটে গেছে। এতক্ষণ ক্ষুধা তাকে যন্ত্রণা দেয়নি। এখন একটু আশ্রয় পেতেই ক্ষুধা তাকে জানান দিচ্ছে। তবু রাশেদ বলল — আপনার বাসায় অসময়ে আর যাব কি, কাল সকালে দেখা করতে আসব। এখন তো ঘরে গেলেই সকলের ঘুমের ব্যাঘাত হবে। দ্রুত বাড়ি ফিরতে পারলেই ভাল হত।

: তোমাদের বাড়িতে তো বাবা কেউ নেই। বিশেষ করে তোমাদের ঘর একেবারে ফাঁকা। বাড়িটাও ভেড়িবাঁধের বাইরে। নদী ঘরের সংলগ্ন বিধায় দাওয়ায় বসেই নদীর স্রোত দেখা যায়। এখন বাড়ি গিয়ে কাউকে পাবে না। খামখা তোমার মন খারাপ হবে। তার চেয়ে ভাল পানিপান্তা চারটা খেয়ে এখানেই আপাতত বিশ্রাম নাও। সকালে উঠে যা করার করো।

www.pathagar.com

রাশেদ আর কিছু না বলে রফিক মিয়ার অনুসরণ করল। দো'চালা ছোট একটি ঘর। ভিতরে কোন পার্টিশন নেই। খড়ের চাল, পাতার বেড়া। ঘরটি এত নিচু যে ঢুকতেই ঠুস করে চৌকঠের সাথে রাশেদ বাড়ি খেলো। ছোট একটি ডেরা, শহরের বস্তির ক্ষুদ্র ঘরগুলির ন্যায় এখানেও অসহায় ক'জন মানুষ জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই রাশেদ সুফিয়া বেগমের কদমবুচি করল। সুফিয়া বেগমের ঘুমের ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটেনি, তবু তিনি রাশেদের মাথা ছুঁয়ে বললেন — বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবি হও।

ছোট কালেও এক ঈদে রাশেদ সুফিয়া বেগমের পা ছুঁয়ে সালাম করেছিল। তখনো তিনি এই দোয়াই করেছিলেন, কিন্তু সেদিন তাদের যে আটচালা টিনের ঘর। দামী আসবাবপত্র ছিল, এখন তার কিছুই নেই। সেদিন সুফিয়া বেগম রাশেদকে কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে চুমো খেয়েছিলেন। আজ তিনি রাশেদকে কোলে টেনে নিলেন না বটে কিন্তু এমন আগ্রহ দেখালেন যার অর্থ হচ্ছে — যদি সম্ভব হতো তোমাকে সুরমা বানিয়ে চোখে দিতাম।

রাশেদকে হাত পা ধোয়ার জন্য পানি দেয়া হল। কাপড় পালটানোর জন্য শুকনো লুঙ্গি দেয়া হল। চাটাই বিছিয়ে বসার জায়গা দেয়া হল। সুফিয়া বেগম বললেন —

: বাবা, ভাত চারটা ছিল। রাতের খাবারের পর পানি দিয়ে রেখেছি। তোমার অসুবিধা হলে গরম ভাত রান্না করে দেই।

: তার প্রয়োজন নেই। যা আছে তা-ই দিন, আমার পান্তা ভাত খাবার অভ্যাস আছে। হোষ্টেলে কত আজেবাজে খাবার খেয়ে থেকেছি।

সুফিয়া বেগম রাশেদকে ভাত দিলেন। আলু দিয়ে শিংমাছ রান্না করা হয়েছে, শাক দিয়ে চিংড়ী মাছের তরকারী। রাশেদ গোগ্রাসে খাচ্ছে। মনে হয় সে অমৃত খাচ্ছে। একজন ভয়ানক ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে চারটা ভাত যে কত প্রিয় এটা রাশেদকে না দেখলে কেউ অনুমানই করতে পারবে না।

রাশেদ ভাত খেতে খেতে একেবারে ঘেমে গেল। ঘন্টা দেড়েক আগে সে যখন বৃষ্টির মধ্যে ভিজে পথ চলছিল তখন তার খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল। অথচ এখন এত গরম ! মনে হয় সে পুকুর থেকে নেয়ে উঠেছে। বাইরে বাতাস না থাকায় ভ্যাপসা গরম লাগছে। সুফিয়া বেগম রাশেদের দিকে লক্ষ্য করলেন। মা-বাপ হারা ছেলের এই শোচনীয় অবস্থা ! দেখে তার খুব মায়া হল। তিনি যদি ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতে পারতেন তাহলে খুব ভালো লাগতো। শিশু বয়সে মা যেমন আদর করে সন্তানের মুখে ভাতের লোকমা তুলে দেন ঠিক সে রকম। তিনি হাত পাখা নিয়ে এলেন এবং পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলেন। সুফিয়া বেগমের অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছেন না। ছেলেটি খাচ্ছে খাক, পেট ভরে খাক। কত বেলা না খেয়ে আছে কে জানে ! কত আদরের সন্তানের আজ কি দুরবস্থা ! মানুষের কান্নার সময় প্রশ্ন করা অন্যায়। কেউ কাঁদতে চাইলে তাকে কাঁদতে দিতে হয়। তেমনি খাবার সময় প্রশ্ন করাও অপরাধ। খাওয়া শেষে তিনি জানতে চাইবেন এত রাতে রাশেদ কোত্থেকে এলো ? ঘোষের হাটে লঞ্চ ভিড়ার কথা বিকেল বেলা। যদি কোন কারণে দেরি হয় তাহলে না হয় সন্ধ্যাই হবে। সন্ধ্যার সময় রওয়ানা হলেও চরকলমী পৌছতে রাত দশটার বেশি লাগার কথা নয়। সময় অনেক পাল্টে গেছে।

www.pathagar.com

আগে কারো সদরে যাবার দরকার হলে একদিন আগে রওয়ানা করতে হত। কিংবা নির্দিষ্ট দিন ভোরে রওয়ানা করলেও কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে পারতো না। সদরে একরাত থাকতেই হতো। যানবাহন বলতে ছিল সেই এক গয়নার নৌকা। নৌকার মাঝি শিঙায় ফু দিত। যার যাবার দরকার হত সে খেয়া ঘাটে গিয়ে দাঁড়াতো। এখন সেই গয়নার নৌকা আর নেই। সব নৌকায় এখন ইঞ্জিন চালিত। যে সব নৌকা সদরে যাতায়াত করে সেগুলিতেও ইঞ্জিন আছে। যেগুলি দিয়ে নদীতে মাছ ধরে সেগুলিতেও আছে। বর্ষা চলে গেলে সদরে যাবার জন্য এখন আর নৌকার দরকার হয় না। এখন রিক্সা যায়, হেলিকপ্টার নামে এক ধরনের ছাউনি ছাড়া গাড়ী আছে। ভাড়া মাত্র বিশ টাকা। এখন ভেড়ির পাড়ে গিয়ে বললেই হয় যে, আমি সদরে যাব, অমনি হেলিকপ্টারের হেলপাররা তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিবে। রাশেদ কি সেই হেলিকপ্টারের কথা জানে না? জানা থাকলে আসতে তো তার এত সময় লাগার কথা নয়। এখন চোখ বন্ধ করলেই দুই ঘন্টার মধ্যে চরফ্যাশন যাওয়া যায়। অথচ তাদের ছোট কালে এটা কল্পনাই করা যেতো না।

চরকমলীর দু'টি অংশ উত্তর কান্দি, দক্ষিণ কান্দি। দুই কান্দিকে আলাদা দুইটি গ্রামের মত মনে হয়। দুই কান্দির মাঝখানে ছোট মাঠ। মাঠ মানে ধানের জমি। এই মাঠের মধ্যস্থান দিয়ে আলের চেয়ে সামান্য উঁচু একটি রাস্তা। এই রাস্তার পাশেই এ অঞ্চলের একমাত্র বিদ্যাপীঠ চরকলমী প্রাথমিক বিদ্যালয়। যদিও রাশেদের দাদার প্রচেষ্টায় এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত তবু তিনি নিজ বাড়ির দরজায় স্কুল স্থাপন করেননি। গ্রামের ঠিক মধ্যখানে এমন জায়গায় স্কুলটি স্থাপন করেছেন যাতে চরকলমীর সব দিক থেকে ছেলেমেয়েরা খুব সহজে আসতে পারে।

রাশেদ যেদিন বাড়ি এলো তার পরদিনই স্কুল দেখতে গেলো, তার বাল্যকালের একটি মাত্র স্মৃতি বিজড়িত স্থান, সে স্থানের প্রতিটি ইঁট শুড়কির সাথে জড়িয়ে আছে রাশেদের কতনা ঘটনা।

তিন.

রাশেদ ছোট বেলায় একবার নদীর ভাঙ্গন দেখতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে নদী ছিল অন্তত দুই-আড়াই কিলোমিটার দূরে। তাদের বাড়ি থেকে উত্তর ওশ্চিমেদেবিপুর বাজার। বাজার সংলগ্ন দেবিপুর মাদ্রাসা। সর্বোপরি দেবিপুর তালুকদার বাড়িসহ সবকিছু একে একে ভেঙ্গে যাচ্ছিল তেতুলিয়ার করালগ্রাসী স্রোতে। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী তালুকদার বাড়ির সুরম্য প্রাসাদের এক একটি ইট যখন তলিয়ে যাচ্ছিল তখন বহুদূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোক এসে দেখতো আর বলাবলি করতো — হায়! তাদের অঞ্চলের গৌরবের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একে কিভাবে রক্ষা করা যায় কিংবা রক্ষা করতে

www.pathagar.com

হলে তাৎক্ষণিক ভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এটা কেউই ভাবেনি। সবাই মনে করতো মানুষ শুধু প্রকৃতির হাতের পুতুল। প্রকৃতি তাদের নিয়ে যেভাবে খেলতে চায়, মানুষ সে ভাবেই পরিচালিত হয়। দলবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি যেন কারোই ছিল না। রাশেদের সেই নদী দেখার ঘটনা খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। মাত্র চৌদ্দ–পনের বছর হবে হয়ত। কিন্তু তখন কল্পনা করাও দুষ্কর ছিল যে, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে রাক্ষসী তেতুলিয়া তাদেরকে পথের কাঙাল বানিয়ে ছাড়বে।

রাশেদ নিজের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। অথচ ব্যাগ রেখে এসেছে রফিক চাচার বাসায়। সে ব্যাগ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সুফিয়া বেগমই সেটা নিতে দেননি। বললেন — তোমাদের বাড়িতে কেউ থাকে না। ঘর একেবারে ভাঙ্গনের মুখে। তুমি আগে একবার দেখে এসো। যদি সুবিধা মনে হয় পরে খবর পাঠালে আমি বাবুলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিব। খুব তো দূরের পথ নয়। আধা কিলোমিটারও হবে কিনা সন্দেহ।

সে হাঁটছে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে নয়। সরকারের তৈরি ভেড়ি বাঁধের উপর দিয়ে। সে একেবারে ধীর পায়ে হাঁটছে আর ডান পাশের খরস্রোতা নদী তেতুলিয়ার দিকে তাকাচ্ছে। এই নদী কত দূরে ছিল। নদী বিধৌত অঞ্চলে তাদের বাড়ি যেন দু'আড়াই মাইল হেটে তারপর নদী দেখতে যেতে হতো। অথচ সেই নদী এখন ঘরের কাছে। ঘরে শুয়ে শুয়ে নদীর তামাশা দেখা যায়। নদী সংলগ্ন সাইড ভেড়ি। ভেড়িটা নদীর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু। অনেকটা পাহাড়ের উপত্যকার মত। বর্ষাকালে নদীর পানি যখন ফুলে ফেঁপে উঠে তখন প্রবল ঢেউগুলি পাড়ের উপর আছড়ে পড়ে। খুব সহজে যাতে ভেড়িবাঁধ ভেঙ্গে না যায় সেজন্যই ভেড়িটা নদীর দিকে এতো ঢালু। অথচ বিপরীত দিক অনেকটা হিমালয়ের মত খাড়া। তবু সহস্র সহস্র মানুষ নদীর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এখানেই ঘর বানিয়ে কোন মতে দিন গুজরান করছে।

পানির অপর নাম জীবন বটে কিন্তু আগুনের চেয়ে পানির লকলকে জিহবা আরো ভয়াবহ। আগুনের লেলিহান শিখায় সব ছাই হয়ে গেলেও মাটি থাকে। সেই মাটির উপর মানুষ আবার নতুন করে জীবন শুরু করে। অথচ পানির কবলে একবার যে পড়েছে সে তো সব হারিয়ে পথে বসেছে।

গ্রাম তার চেনা হলেও পথ তার অচেনা। ভেড়ি বাঁধ নির্মাণ করার পর সে আর গ্রামে আসেনি। এক সময় মনে হতো আর কখনো ফিরবে না। যেই গ্রামে তার ঘনিষ্ঠ আপনজন কেউ নেই, সেখানে এসে লাভ কি ! সে এই কথার উপর বেশিদিন স্থির থাকতে পারেনি। জন্ম ভূমির সাথে বোধ হয় নাড়ীর একটা টান আছে। এজন্য মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আবার তাকে গ্রামে ফিরতে হল। মায়ের কোল যেমন প্রতিটি সন্তানের নিরাপদ আশ্রয় তেমনি মাতৃভূমিও সান্ত্বনা লাভের একমাত্র উপায়। মা এবং মাতৃভূমি যার নেই, তার মত হতভাগ্য এই সংসারে কেউ নেই। রাশেদের মা নেই, মাতৃভূমি তো আছে। যেদিন গ্রাম থাকবে না, সেদিন না হয় আসবে না। রাশেদ হেঁটে চলেছে। নদী থেকে উত্থিত বাতাস উপেক্ষা কর সে এগিয়ে চলেছে। অচেনা রাস্তায় অচেনা কত মানুষ এলোমেলো ভাবে বসবাস করছে।

www.pathagar.com

ডান পাশে ভেড়ির উপত্যকা জুড়ে ছোট ছোট বাবলা গাছ। মনে হয় বনবিভাগ বছর খানেক আগে এসব গাছ লাগিয়েছে। নদী থেকে একটা কলকল শব্দ আসছে। সবই রাশেদের কাছে অপার্থিব মনে হচ্ছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একবার কক্সবাজার গিয়েছিল। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে পানির কলকল শব্দ শুনতে তার খুব ভাল লেগেছিল। আজও তার ভাল লাগছে। অসম্ভব ভাল লাগছে। তার ইচ্ছে হল — উঁচু এই ভেড়ি বাঁধের ঢালুতে একবার গড়াগড়ি দেয়। সিনেমার নায়ক নায়িকারা পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে গড়াগড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। সেটার মধ্যে বোধ হয় এক ধরনের আনন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথ ছোট বেলায় তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাদের এক কুঠিবাড়ি যেতেন। পাশেই ছিল ছোট পাহাড়। বাবা আড়ালে গেলেই বালক রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ের গায়ে গড়াগড়ি খেতেন। ঘাসের কাছে কান নিয়ে তিনি তাদের মনের কথা জানার চেষ্টা করতেন। আজ রাশেদেরও ইচ্ছে হল সে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবে এবং ভেড়িবাঁধের গায়ে যে ঘাসবন আছে তার উপর একবার গড়াগড়ি খাবে।

মাটির সাথে বুক লাগিয়ে সে তার উত্তাপ অনুভবের চেষ্টা কবরে। কিন্তু ভেড়ি বাঁধের সর্বত্র লোক গিজগিজ করেছে। শিশু ও মহিলারা সারা ভেড়িবাঁধ জুড়ে হাঁটা হাঁটি করছে। কোন কোন স্থানে বাঁধের উপরেই মল ত্যাগ করে রেখেছে। ফলে তার আর গড়াগড়ি দেয়া সম্ভব হলো না।

পাগল পাগলামী করে লোকদের দেখানের জন্য। তারা নির্জনতা ছেড়ে কোলাহলে যায়। তাতে পাগলামীর একটা স্বীকৃতি মিলে। কিন্তু প্রকৃত পাগল যারা তারা সিদ্ধি লাভের জন্য ধ্যান করে। তার জন্য লোকালয় ছেড়ে বনে যায়, নির্জনে নির্বিঘ্নে প্রার্থনা করে। খোদার আশীষ লাভ করে। রাশেদের যে ইচ্ছা সেটা পূরণ করতে গেলে পাগলামীর স্বীকৃতিই মিলবে। মনের সাধ পুরণ হবে না। এখন ভেড়িবাঁধের গায়ে গড়াগড়ি দিলেই দু'চারজন মেয়েছেলে ছুটে আসবে। তারা অবাক হয়ে রাশেদের কপালে হাত দিবে। জানার চেষ্টা করবে — এই যুবা পথিকের আবার কোন অসুখ হল কিনা!

রাশেদ প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। কিন্তু পরিচিত তেমন কারো সাথে দেখা হল না। বুড়োমত একজন লোককে সে চিনেছিল বটে এবং সালামও দিয়েছিল, কিন্তু লোকটি তাকে চিনেছে বলে মনে হলো না। রাশেদ নিজে থেকে তাকে কিছুই বলেনি। সে ভাবছে — তাদের বাড়িতে এত লোকজন, তাদের কারো সাথে তার দেখা হলো না কেন? মাতাব্বর বাড়ির কেউ কি আজ বাইরে বের হয়নি?

অনেক দিন পর সে বাড়ি যাচ্ছে। যদিও বাড়িটা নদী ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এবং শেষ অস্তিত্বটুকু রক্ষার জন্য সকলে চিন্তিত, তবু রাশেদকে দেখে অনেকে হয়ত চমকে উঠবে। মাতাব্বর বাড়ি এ অঞ্চলের সম্মানিত বাড়ি। এবং তার দাদা ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তারা রাশেদকে দেখা মাত্র কোলে টেনে নিবে। উত্তর ঘরের দাদী তো তার কথা শুনা মাত্র দৌড়ে আসবেন এবং পাশে বসিয়ে বাতাস করবেন আর জানতে চাইবেন — সে এত দিন ছিল কোথায়? তাকে এত চিঠি দেয়া হয়েছে সে কোন চিঠি পেয়েছিল কিনা? পেলেও বা উত্তর দিল না কেন?

www.pathagar.com

রাশেদ লক্ষ্য করে দেখলো তাদের বাড়ি বরাবর পূর্বপাশ দিয়ে যে ভেড়িবাঁধ ঠিক এখানটায় ছিল তাদের কাঁটাবাগান। মূলবাড়ি থেকে অনেকটা পূর্বদিকে ছিল এই বাগান। বাগান নয় যেন গভীর অরণ্য। দিনের বেলায়ও কেউ শিয়ালের ভয়ে এই বাগানে ঢুকতে পারতো না। কাঁটা বাগানের উত্তর পাশ চেপে শনক্ষেত। সেই শন ক্ষেতে দিনের বেলায়ও শিয়াল ডাকতো। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, মাত্র ক'বছর আগেও এখানে ছিল বাগদাশ ও বিষাক্ত সাপের মত হিংস্র প্রাণীদের বসবাস। বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল বিশাল এক শিমুল গাছ। শিমুল গাছে দিনে দুপুরেও ভূত পেতনীরা ঝগড়া করতো। তাদের কাজের ছেলে দুলু কতদিন সেই শিমুল গাছে ভূতদের মারামারি দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন এসব মনে হলে যে কারো হাসির উদ্রেক হবে। রাশেদের নিজের কাছেই এসব অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আগে যেখানে শিমুল গাছটা ছিল, সে বরাবর পশ্চিম দিকে তাদের বাড়ির পথ। পথের পাশেই ভেড়িবাঁধ সংলগ্ন একটি টং দোকান। দোকানের ঝাঁপ আটকানো। দোকানের সামনে একটি টুল। টুলের উপর বসে বুড়োমত একজন লোক কাঠি দিয়ে গা চুলকাচ্ছিল। লোকটি রাশেদকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছেন বলেই মনে হল। কাছাকাছি আসতেই রাশেদ তাকে সালাম দিল। লোকটি এগিয়ে গিয়ে বলল : তুমি কি বেঁচে আছ ভাই? রাশেদ এগিয়ে গিয়ে আগে তার কদমবুচি করল। পরে বলল, বেঁচে থাকব না? এত তাড়াতাড়ি মরে যাব কেন? আপনি কেমন আছেন?

: ভাল আছি নাতি। তবে নদী আমাদের সব নিয়ে গেল। আমরাও নদীর বিরুদ্ধে লড়াই করেই টিকে আছি।

: আপনি অসময়ে এখানে একা একা বসে কি করছিলেন?

: একটা দোকান দিয়েছি। এই দোকানটা আমার । দুপুরের ভাত খেয়ে এলাম দোকান খোলার জন্য। কেউ নেই, এজন্য দোকান না খুলেই বসে আছি।

: দাদা আপনি দোকান করছেন?

: কি করব ! পাঁচ/ছয় বছর থেকে পরিশ্রমের কোন কাজ করতে পারি না । সকাল সন্ধ্যায় এখানে বসি। লোকজন আসে, তাদের সাথে গল্প গুজব করি। সময় কাটে। তোমার লাগেজপত্র কোথায়?

: রফিক চাচার বাসায়।

: রফিকের ঘর তো তোমার চিনার কথা না, অসংখ্য নদীভাঙ্গা মানুষের মত সেও তো ভেড়ির পাশে থাকে।

: বাড়ি আসার পথে আপনার সাথে যেমন দেখা হলো, গতরাতে চরকলমীতে পা দেয়ার আগেই তার সাথে দেখা হয়েছে।

: খুব ভাল হয়েছে দাদু, রফিকের দেখা পেয়ে তোমার ভালই হল। রফিকের আগের ধনদৌলত কিছু নেই কিন্তু তার মন আছে। বছর খানেক আগে আমার কাছে একটা ব্যাপার নিয়ে কয়েকবার এসেছিল। এখন আর আসে না।

: কি ব্যাপার নিয়ে এসেছিল?

www.pathagar.com

: এসেছো [illegible] শুনতে পাবে। থাকবে তো কয়দিন?

: জ্বি দাদা অনেকদিন পর এলাম তো, কয়দিন বেড়াবো।

: ঠিক আছে বাড়ি যাও। সকলের সাথে দেখা করে এদিকে একবার এসো।

রাশেদদের বাড়ি ছিল পশ্চিম মুখী। পশ্চিম পাশে প্রশস্ত দরজা। দরজার একপাশে পাকা মসজিদ আরেক পাশে টিনের দোতলা কাচারী। উপর তলায় লজিং মাষ্টারের থাকায় জায়গা এবং বাড়ির ছেলেদের পড়াশোনার ঘর। আর নিচের তলায় ছিল দাদার বৈঠকখানা। তিনি এখানে বসেই লোকদের বিচার আচার করতেন।

মাতাব্বর বাড়ি বিভিন্ন কারণে খুব নাম করা হলেও ঘরের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচখানা। রাশেদের প্রপিতামহ এক শতাব্দী পূর্বে যখন হাতিয়া থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন তখন থাকার ঘর ছিল মাত্র একখানা। এছাড়া গোলাঘর, গোয়াল ঘর, নামাজের ঘর ইত্যাদি ছিল। সবই ছিল খড়ের তৈরি। প্রপিতামহ আফিরুদ্দিন ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। এছাড়া তিনি সুচতুরও ছিলেন। তিনি এখানে আসার সময় অন্যদের মত খালি হাতে আসননি। টাকা পয়সা নিয়েই এসেছিলেন। এখানে এসেই সস্তা দামে প্রচুর জমি কিনেন। থাকার জন্য এবাড়িটি কিনেন। এটি ছিল পাতিল ওয়ালাদের পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িটি ছিল দক্ষিণ মুখী। একে তিনি পশ্চিমমুখী করে মূলরাস্তার সাথে সংযুক্ত করেন। বাড়ির দরজায় নির্মাণ করেন মসজিদ। চরের সমস্ত লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের জন্য পাঠশালা খোলেন। সেই আফিরুদ্দিন সাহেবের ছিল চার ছেলে এক মেয়ে। তিনি বেঁচে থাকতেই পাঁচ সন্তানের জন্য পাঁচটি টিনের ঘর নির্মাণ করে যান। পরবর্তীকালে আহমদুল্লা মৌলবী সাহেব যখন এ গ্রামে এলেন তখন থেকেই তিনি রাশেদের দাদার প্রধান সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি মসজিদ পাকা করলেন, মক্তব খুললেন, পাঠশালাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা দিলেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার কারণে দু'জন মানুষের নাম চরকলমীর ছেলেবুড়ো সকলের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে আছে। একজন তার দাদা এসাহাক মাতাব্বর দ্বিতীয়জন মৌ: আহমদুল্লা সাহেব।

বাড়িতে ঢুকতেই রাশেদের সাথে অনেকের দেখা হয়ে গেল। তারা খুব আন্তরিকতার সাথে রাশেদকে বুকে টেনে নিল। অনেক দিনের অনুপস্থিতির কারণে মানুষের মধ্যে গ্যাপ তৈরি হয়। কিন্তু এখানে সেটা হয়নি। বাড়ির লোকজনের সাথে তার যে রক্তের সম্পর্ক বাড়িতে পা ফেলা মাত্র সে খুব সহজে অনুমান করতে পারল। ছোট–বড়, মহিলা–পুরুষ যে যেখানে ছিল রাশেদের কথা শুনে সকলে ছুটে এলো। উত্তর ঘরের ছোট দাদী ছুটে এসে রাশেদকে জড়িয়ে ধরলেন। গালে চুমো দিতে দিতে বললেন — নাতি, তুই এখনো বেঁচে আছিস? সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন — আমি বলছিলাম না — রাশেদ বাঁইছা আছে। সে ঠিক সময় মত উপস্থিত হবে। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করনি। এখন দেখলে তো। রাশেদকে বললেন — চল নাতি, আমার ঘরে চল, তোকে আর আমি ছাড়ব না। কোনদিন ছাড়ব না। বলতে বলতে রাশেদকে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

বাড়িতে যে পাঁচটি ঘর ছিল, তার দু'খানা পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমপাশে এখন শুধু ন্যাড়া ভিটা। দক্ষিণ পাশের ঘরটিও অর্ধেক ভাঙ্গা হয়েছে। টিনের চাল নামিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত পাটাতনসহ ঘরের বেড়া ঠিক আছে। পূর্ব ভিটায় দোতলা টিনের ঘর। যে ঘরে এক সময় রাশেদের দাদা দাদী ও বাবা মা থাকতেন। হয়ত ক'দিন পর ধরাপৃষ্ঠ থেকে এই ঘরের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে। রাশেদের জন্ম হয়েছিল এই ঘরে এবং বড়ও হয়েছে এখানেই। অথচ আজ সেই জাকজমকপূর্ণ ঘরটি অযত্নে-অবহেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। রাশেদ সেদিকে একবার তাকাতেই তার মনে হল একজন কঙ্কালসাড় বৃদ্ধ যেন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। ঘরের দিকে তাকাতেই তার অন্তর হু হু করে উঠল। কোথায় যেন সে পড়ে ছিল — পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল বলেই জগৎ সংসার এত সুন্দর, এত মনোহর। মানুষের বসবাস না থাকলে এই রমনীয় পৃথিবীটা দানবে ছয়লাব হয়ে যেতো। আর কয় বছরে উহার আকৃতি-প্রকৃতি এত বিশ্রী আকার ধারণ করতো যে উহা আর মনুষ্য বাসের উপযোগী থাকতো না।

উত্তর ভিটার ঘরে কিছুক্ষণ থাকার পর রাশেদ নিজের ঘরে এলো। বাইরে থেকে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, ভিতরের অবস্থা আরো ভয়াবহ। কোন রুমেই আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। সে দোতলায় উঠার চেষ্টা করল। কিন্তু সিড়ি না থাকায় উঠা গেলো না। পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি চিহ্ন জড়িত যে দামী পালংক খানা ছিল সেটাও এখন আর নেই। রাশেদ একজনকে জিজ্ঞেস করল তাদের ঘরের জিনিসপত্র কোথায়, জবাবে সে জানতে পারল ঘরের অনেক বস্তুই বিক্রি করে ফেলা হয়েছে। সামান্য যা আছে সেটা উত্তর ঘরে আছে। ঘরের লোকজন নেই, কে কার জিনিস কতদিন পাহাড়া দিবে ! তবু কিছু হয়ত থাকতো যদি নদী ভাঙ্গন এত দ্রুত না হতো।

রাশেদ বুঝল — সে মূলত একটি মৃত ছেলে। এই ঘরের সব লোক মৃত এটা ভেবেই যার যা করার তাই করেছে। এতে কারো দোষের কিছু নেই। সুদীর্ঘ তিন বছর পর সে গ্রামে ফিরেছে। এমন গ্রাম যা ধীরে ধীরে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সে যদি গ্রামে থাকতে চায় তাহলে প্রয়োজনীয় আসবাব জোগাড় করে নিতে তেমন সমস্যা হবে না। আর যদি ফিরে যায় নিরুদ্দেশে তাহলে তো এ সবের কোনই প্রয়োজন হবে না।

রাশেদ নিজ বাড়িতে পরপর দু'দিন থাকল। এই দু'দিনে সে বাড়ির সকলের সম্পর্কে অবগত হল। বাড়িতে এক সময় তার বয়সী দু'জন বালক ছিল। আলমগীর ও ফিরোজ । এরা প্রত্যেকে কমবেশি লেখা পড়া জানে। আলমগীরের স্বভাব একটু ত্যাড়া টাইপের হলেও অন্যজন ছিল অনেকটা মার্জিত ও শান্ত। জানা গেল, আলমগীর এখন পাঁচ/ছয়টা ছান্দি নৌকার মালিক। সে প্রতিবছর মাঝিদের কাছে দাদনে টাকা লাগায়। এবং তাতে প্রচুর আয় রোজগার হয়। কচুখালী ভেড়িবাঁধের উপর তার একটি মহাজনী ঘর আছে। সেখানে সারা বছর সুতার ব্যবসা চলে। এছাড়া হাটবারে আলমগীর সেখানে বসে। ফিরোজ নাকি সদরে একটি ডাক্তার খানায় কম্পাউণ্ডার হিসেবে কাজ করে। বাড়িতে রাশেদের পাঁচ দাদার মধ্যে ছোট দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়িদের মধ্যে আছে কেবল উত্তর ঘরের দাদী। বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়ে আছে অনেক, যাদের বেশির ভাগকে সে চিনে না। নদী ভাঙ্গনে জমিজমা বাড়িঘর সবই পানির তোড়ে ভেসে গেছে। অথচ মানুষ ভেসে গেল না। ছেলে-মেয়ে বাড়ছে

www.pathagar.com

জ্যামিতিক হারে। রাশেদ যখন বালক ছিল তখন সারা বাড়িতে ছিল ছোট-বড় মিলে সাত-আটজন ছেলে-মেয়ে। আর এখন সেই ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কয়েক গুন ছাড়িয়ে যাবে। তাদের সময়ে সকলের মধ্যে স্কুলে যাবার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। কেউ কোন কারণে স্কুল ফাঁকি দিলে প্যাদা পাঠিয়ে দেয়া হত তাকে ধরে নেয়ার জন্য। অথচ এখন স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে কারো তেমন আগ্রহ নেই। আগে বর্ষার সময়ে যখন সারা চরকলমীতে পানি থৈ থৈ করতো তখনও তারা স্কুলে যেতো নৌকা দিয়ে। কাজের ছেলে দুলু সবাইকে নৌকায় করে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতো।

ঐতিহ্যবাহী মাতাব্বর বাড়ির ছেলে মেয়েরা এখন হাভাবে কংকালসাড়। এখন কেউ আর স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। যাবার জন্য কোন ধরনের চাপাচাপিও নেই। পড়ালেখার পরিবর্তে এদের কেউ কেউ ইলিশ জালে কাজ করে। কেউ দোকানদারী করে, কেউবা রুজি রোজগারের জন্য অন্যপথ অবলম্বনের চেষ্টা করছে। পৃথিবীর কোন দেশেই শিক্ষা গ্রহণে এতটা গাফলতি নেই। এমনকি এদেশের শহর নগর গুলিতেও স্কুলে ভর্তি হবার কঠিন প্রতিযোগিতা অথচ সেই আলোর ঝলক নদী হাওড় বিল পেরিয়ে সমুদ্র বিধৌত এই অজগাঁয়ে এক বিন্দুও এসে পৌছেনি। রাশেদের বুক থেকে একটি ভারী নিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে রাশেদ তাদের বাড়ির পুকুরের উত্তর পাড়ে গেল। তার ইচ্ছে এখানে বসে আজ সে সূর্যাস্ত দেখবে এবং সূর্যাস্তের পরও অনেক্ষণ বসে থাকবে। সে গিয়ে যে পুকুর পাড়ে বসল এটি তাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় পুকুর। এটির দক্ষিণ পাশে ছিল মসজিদ ও কাচারী ঘর। মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তবও ছিল। মসজিদের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে ছিল পাঁচিল ঘেরা করবস্থান। তাদের বংশের তিন পুরুষের সকলেই শায়িত ছিলেন এখানে। প্রপিতামহ আফিরুদ্দিন, দাদা দাদী, বাবা মা ও আহমদুল্লা সাহেব চিরনিদ্রায় শায়িত থাকার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেল এই মায়ার পৃথিবী থেকে। পুকুরের দক্ষিণ পাড়েই ছিল কাচারীঘর সংলগ্ন পাকাঘাট। কাচারীর সাথে লাগোয়া ফুল বাগান। চরকলমী স্কুলে একবার একজন প্রধানশিক্ষক এসেছিলেন উত্তর শাহবাজপুর থেকে। কোলকাতার পোষ্টমাষ্টার বাবু যেমন হঠাৎ অজপাড়া গাঁয়ে এসে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, অনেকটা মাছকে পানি থেকে তটে তোলার মত অসহনীয় অবস্থা। ইনিও খুব কষ্ট করে এই বিচ্ছিন্ন গাঁয়ে কিছুদিন ছিলেন। যতদিন ছিলেন পরিবেশটা আনন্দময় করে রেখেছিলেন। তিনি কাচারীর সম্মুখে অনেকটা স্থানজুড়ে ফুল বাগান করেন। বাগানে রোপন করলেন বিভিন্নজাতের ফুল গাছ। গোলাপ, জবা, হাস্নাহেনা, বেলি, টগর অর্থাৎ একটি গ্রামে যা যা পাওয়া সম্ভব সব ফুল গাছই লাগালেন। দাদাজান ঘোষণা করে দিলেন — মাষ্টার সাহেব তার আনন্দের জন্য যা করবেন তাতে কারো আপত্তি থাকবে না। মাষ্টার সাহেব ইচ্ছেমত গাছ লাগালেন। সকল গাছের মধ্যে ভূয়সী প্রশংসা পেলো তার হাস্নাহেনা নামের ফুল গাছটি।

আষাঢ়-শ্রাবণে যখন হাস্নাহেনার ফুল ফুটত, তখন ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ করত। জ্যোৎস্না রাত হলে দাদাজান বাড়ি থেকে ছুটে আসতেন। মাষ্টার সাহেবকে ডেকে বলতেন — মাষ্টার সাহেব, ও মাষ্টার সাহেব, আসুন, আপনার বাগানে কতক্ষণ চেয়ার পেতে বসি। দেখেছেন আজ কেমন ফকফকা জ্যোৎস্না? দু'জন হয়ত চেয়ার পেতে বসেছেন। দাদা

www.pathagar.com

বললেন — মাষ্টার সাহেব, আজ এত জ্যোৎস্নালোক! এত সুন্দর ফুলের ঘ্রাণ তবু মন ভরছেনা! মনে হয় আরো কিছু দরকার। শুনেছি আপনি নাকি একজন ভাল বংশীবাদক। নিশীথ রাতে চারদিক যখন নিথর হয় তখন আপনি বাঁশি বাজান। দয়া করে আপনার বাঁশিটা কি নিয়ে আসবেন? মাষ্টার সাহেব আমতা আমতা করে বলছেন — নাতো, নাতো! কে বলেছে আমি বাঁশি বাজাই?

: কে বলেছে, সেটা জানার দরকার কি, আপনি দয়া করে বাঁশিটা নিয়ে আসুন, আপনি না পারেন আমি বাজাব। আমিও ছোট বেলায় বাঁশি বাজাতাম। আমার যে বুড়ো গিন্নীকে দেখছেন একে আমি বাঁশির সুরে পাগল করে ফেলি। তারপর হা-হা-হা। মাষ্টার সাহেব?

: জ্বি।

: তিন বছর আগে এখানে একটা গানের আসর বসেছিল। মৌঃ আহমদুল্লা সাহেবের আগ্রহেই হয়েছিল। গ্রামের অন্য মৌলবীরা অবশ্য বাধা দিয়েছিল। তারা বলল— যে বাড়িতে মসজিদ সে বাড়িতে গান নাজায়েজ। কিন্তু আহমদুল্লা সাহেব বললেন — এতে যদি গুণা হয়, আমার হবে। সব পাপের দায়িত্ব আমার, এখানে গানের আসর হবেই। তারপর কি হল জানেন?

: জ্বি শুনছি।

: চরকাশেম থেকে এক গায়েন এল, সাইদুর রহমান বয়াতী। জারী-সারী-মারফতী, হাশেমকাজীর পুঁথি আরো কত গান যে হল। সারা রাত ধরে গ্রামের সব মানুষ গান শুনল। কিন্তু কি আশ্চর্য জানেন — সে রাতে আহমদুল্লা সাহেবের মেয়ে অসুস্থ থাকায় তিনি জামাই বাড়ি চলে গেলেন। তার গান শুনা হল না। মাষ্টার সাহেব?

: জ্বি।

: আপনি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যত টাকা লাগে আমি দিব। চর কাশেম যাবেন, সাইদুর রহমানসহ তার সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা আছে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবেন। মতিনুদ্দিন নামে আমাদের গ্রামেও একজন গায়েন আছে তাকেও বলবেন। মৌলভী আহমদুল্লা সাহেবকে গান শোনাতে না পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

: আমি একজন শিক্ষক মানুষ। একাজ করলে লোকে কি বলবে?

: কে কি বলল তাতে কিছু যায় আসে না। আপনার যা ভাল লাগে তাই করবেন — এটাই নিয়ম। পৃথিবীতে কতদিন বাঁচবেন, লোকে কি বলবে - এই ভয়ে যদি কোন আনন্দই না করলেন সমস্ত মানব জীবনই অর্থহীন হয়ে যাবে। মৌলভী আহমদুল্লা সাহেবের দর্শন কি জানেন?

: জ্বিনা, আপনি বলুন। আমি শুনছি।

: ওনার দর্শন হচ্ছে — যে লোক পৃথিবীর একজন সুন্দরীর মনজয় করতে পারে না, সে বেহেস্তে গিয়ে নূরের তৈরি হুর পাবে, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ভোগ করতে অক্ষম সে পরকালে গিয়ে আল্লার সান্নিধ্য পাবে — এটাও তিনি মানেন না।

: উনি আলেম মানুষ। অনেক কিছু জানেন বুঝেন।

www.pathagar.com

: মনে হয় তার জীবন দর্শন অত্যন্ত পরিস্কার। এটা আমার ভাল লাগে।

: আমারও এসব ভাল লাগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জানেন — গ্রামের অথর্ব মানুষগুলি তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলো।

: মর্যাদাবান মানুষরাই অন্যের মর্যাদা দিতে জানে। অন্যদের তো সম্মানবোধ সম্পর্কে ধারণাই নেই। ইতিহাসে যা প্রমাণিত সত্য তা হল মোগলদের আগমণের পূর্বে ভারতীয়রা ভাল করে ইমারতও বানাতে জানতো না। মোগল আমলে এই উপমহাদেশে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয়। কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করতে হয়, কিভাবে মানুষকে সম্মান জানাতে হয় — এমন কি সুন্দর করে খাবার পরিবেশন করার পদ্ধতিও ভারতীয়রা তাদের কাছ থেকে শিখে।

: আমি মুখ-সুর্খ মানুষ। অত কিছু জানি না। আমি চিনি শুধু এই গ্রাম এবং গ্রামের একজন শ্রেষ্ঠমানুষ মৌলভী আহমদুল্লা সাহেবকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান কি ছিল জানেন? যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী আর্মীদের একটা শীপ আটকে গেল চরজাহাজ মারায়। পনের দিন পর্যন্ত সেই জাহাজ আটকা পড়ে রইল। চারতলা বিশাল জাহাজে ছিল অস্ত্র আর গোলাবারুদ। শীপে যে সকল সৈন্য সামন্ত ছিল তারা উপরে উঠে এলো এবং নাগরপুর হাট সংলগ্ন ইংরেজ আমলের জমিদারদের পরিত্যক্ত যে আলীশান কুঠিবাড়ি ছিল । সৈন্যরা গিয়ে সেই কাচারী দখল করল। শুধু দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা চারদিকে অত্যাচার অবিচার শুরু করল। মোলভী আহমদুল্লা সাহেবের এটা সহ্য হল না। তিনি গোপনে দল তৈরি করলেন এবং একরাতে দলবল সহ নীলকরদের কাচারী দু'টি পুড়িয়ে দিয়ে এলেন। বলুন, একজন গ্রাম্য মোলভীর এই দুঃসাহসিক কাজের কথা কোন কিতাবে লেখা থাকবে?

: সব কথা ইতিহাসে লেখা হয় না। লেখা সম্ভবও না। তবে অসংখ্য মানুষের প্রচুর আত্মত্যাগের কারণেই আমরা আজ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক।

: মাষ্টার সাহেব?

: জ্বি

: আপনার বাঁশিটা নিয়ে আসুন।

মাষ্টার সাহেব বাঁশি নিয়ে এলেন। দাদা বাঁশির সুর তুললেন। তিনি বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন আর তার দু'চোখ বেয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই যে কি উথাল-পাতাল সুর। তার বাঁশি শুনে বাড়ির লোকজন চলে এলো। আশ-পাশের লোকরা এলো, মৌলভী আহমদুল্লা সাহেব এলেন। তিনি জীবনের শেষ বাঁশি বাজিয়ে সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাতেই প্রাণ ত্যাগ করলেন.....।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সোনালী আভায় সারা পশ্চিমাকাশ রঙিন হয়ে উঠেছে। নদীতে ভেসে আছে অসংখ্য জেলে নৌকা। তটের কাছাকাছি একটি পালতোলা নৌকার ছায়া পড়েছে নদীতে। বাতাসের চাপ কম বিধায় নদীর পানি কিছুটা স্থির। তবু ছলাত ছলাত ঢেউ আছড়ে পড়ছে খাড়া তীরের উপর। লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে — নদী ভাংছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেভাবে ভাঙ্গে ভাদ্র আশ্বিন মাসে সেভাবে ভাঙ্গে না। শীতের আগমনী

www.pathagar.com

বাতাসে নদীর স্রোত খানিকটা ধীর লয়ে বইতে শুরু করে। তখন স্রোতের টানে কদাচিত ছোট ছোট মাটির চাঁই ভেঙে পড়ে। কিন্তু বর্ষা মওসুমে নদীর চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। তখন বেশ কতকটা স্থান ঢেউয়ের ধাক্কায় হঠাৎ ধ্বসে যায়।

যে পুকুর পাড়ে রাশেদ বসে আছে,সে পুকুরটার অর্ধাংশ অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। বড় দীঘির মত এই পুকুরটাও এখন নদীর অংশ। নদীতে জোয়ার এলে ঘোলা পানিতে পুকুর টৈটুম্বুর হয়ে যায়। ভাটার সময় পানি অনেক নিচে চলে আসে। দক্ষিণ পাড়ে যেখানে কাচারী সংলগ্ন পাকাঘাট ছিল সেটার কিছু অংশ ঠিক আছে। কিন্তু পানি বিশ্রী রকম ঘোলা বিধায় এই পানিতে তেমন কেউ গোসল করে না।

রাশেদ যেখানে বসে আছে তার বরাবর আরেকটু সামনে একটি অর্জুন গাছ ছিল। বিশালাকায় দৈত্যের মত সে গাছ। গ্রাম ছাড়িয়ে বহু দূর দূরান্ত থেকে সে গাছটা দেখা যেতো। দাদী বলতেন এখানে নাকি আগে শকুনদের বসবাস ছিল। তারা এগাছে বাসা বানাতো, ডিম পাড়তো এবং এক সময় ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসতো। সারা উজান অঞ্চলের শকুনদের দরবার ছিল এগাছে এবং দিনের যে কোন সময়ে তারা সকলে এখানে সমবেত হতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে শকুনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। আর এখন তো সেই অর্জুন গাছই নেই, শকুন আর আসবে কোত্থেকে?

পুকুরের এই পাড়টা আগে জংলার মত ছিল। সন্ধ্যার পর এখানে আসতে ভয় লাগতো। কাঁটা বাগানের মত এখানেও শিয়াল বাস করতো এবং কাচারী ঘর থেকে রাতবিরাতে শিয়ালের হুক্কা হুয়া শুনা যেতো।

রাশেদ এক দৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ লালীমা ছিল নদীতে একটা ফর্সা আভা ছিল। এখন ধীরে ধীরে কালো আঁধারে চারদিক ছেয়ে গেছে। তবু তার কাছাকাছি স্থান দিয়ে যেসব নৌকা ট্রলার বা ছোট লঞ্চ যাতায়াত করে সেগুলি তার চোখে পড়ছে।

হঠাৎ রাশেদের পিছনে রিনরিনে শব্দ হল। তার মনে হল কেউ একজন চুপিসারে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে হতে পারে? নিশ্চয়ই কোন মানুষ। অর্জুন গাছ থাকলে ভূত-প্রেতের কথা ভাবা যেতো কিংবা জংলা থাকলে বুঝা যেতো শিয়াল এসেছে। এখন সে রকম কিছু ভাববার অবকাশ নেই। এখন নিশ্চয়ই কোন মানব সন্তান এসেছে। পশু হলে এতক্ষণে তার আগমণ টের পাওয়া যেতো। কারণ, পশুদের মনে Quricity নেই এবং তারা আত্মগোপনও করতে জানে না। কে হতে পারে? রাশেদ কয়েক জনের কথা ভাববার চেষ্টা করল। ফিরোজ, ছোট দাদী বা আলমগীর। কিন্তু তাদের কেউ কৌতূহলী মনোভাব নিয়ে চুপিসারে এসে দাঁড়াবে — তার মনে হয় না। একবার ইচ্ছে হল পিছন ফিরে তাকায়। আবার ভাবল — সে তাকাবে না, যে এসেছে সে নিজের আগ্রহেই এসেছে। সুতরাং স্বেচ্ছায় তিনি আত্মপ্রকাশ করুন।

এতক্ষণে তার মনে হল — সে মগবীবের নামাজ পড়েনি। এটা মসজিদওয়ালা বাড়ি। ঠিক সময় মত মুয়াজ্জিনের আজান দেয়ার কথা। কিন্তু এখন যেহেতু মসজিদ নেই, সুতরাং আজান দেয়ারও তাকিদ নেই। সে দু'দিন বাড়িতে থাকলো অথচ নামাজের প্রতি কেউ খুব আগ্রহী এটা তার চোখে পড়ল না।

www.pathagar.com

রাশেদ ঠিক করল, সে আজে বাজে কিছু ভেবে মন নষ্ট করবে না। এখন থেকে সে হাসার চেষ্টা করবে। প্রাণপণ হাসি। নিজে হাসবে এবং অন্যদের হাসির জোয়ারে ভাসিয়ে নিবে। এই যে হাজার হাজার নদী ভাঙ্গা মানুষ, তারা যেন প্রকৃতির হাতের পুতুল, নদীর নিদারুণ ভাঙ্গনের কবলে পড়ে তারা যেন হাসতেই ভুলে গেছে। বাড়িতে সে যে ক'দিন বেড়াবে বাড়ির মানুষগুলোকে আনন্দে মাতোয়ারা করে রাখবে। আর কান্না নয়। এবার থেকে নদী বিধৌত এ অঞ্চলে কেবল হাসির চাষ হবে।

এবার খুব কানের কাছে চুড়ির টুংটাং শব্দ হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাশেদ পিছনে ফিরে তাকালো। সে দেখলো তার পিছনে খুব সুন্দরী একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবছা অন্ধকারেও মনে হচ্ছে তার শরীর থেকে রূপ ঝলকে বেরুচ্ছে। তার চিনতে কষ্ট হল না — রফিক চাচার মেয়ে ইয়ানূর এতক্ষণ তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাশেদ বসে থেকেই বলল — ইয়ানূর তুমি কেমন আছো? ইয়ানূর এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। সে আগের মতই সঠান দাঁড়িয়ে রইল। রাশেদ আবার বলল — ইয়ানূর আসো, আমার পাশে কিছুক্ষণ বসো। আজকের আকাশটা এত সুন্দর! বসলে তোমার ভাল লাগবে। ইয়ানূর খুব ধীর পায়ে এগিয়ে এলো এবং রাশেদের গা ঘেঁষে তার পাশে বসল। রাশেদ বলল —

: তুমি আসাতে আমার খুব ভাল লাগছে, এতক্ষণ একা একা বসেছিলাম। কতদিন পর বাড়িতে এলাম। ভাবলাম সবার সঙ্গে দিনভর গল্প করব। আনন্দ উল্লাস করে ক'টা দিন কাটিয়ে দিব। অথচ সবাই কেন যেন আমাকে ভয় পাচ্ছে। সকলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। এই যে সারা বিকেল ধরে নদীর পাড়ে বসে আছি, কেউ একটু ফিরেও তাকাচ্ছে না। যেন আমি অচেনা একজন পথিক....। প্রথম দুই-তিনদিন.এমনটা মনে হয়নি।এখন সন্দেহটা ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হচ্ছে।

: ভাইয়া, ঠিকই ধরেছো, তুমি অচেনা পথিক। কিছুক্ষণ পর আমার কথাবার্তা শুনলেও তোমার মনে হবে — আমি তোমাকে চিনি না।

: এমন হচ্ছে কেন ইয়ানূর?

: ভাইয়া, সময় পাল্টে যাচ্ছে। তিন বছরে এই তেতুলিয়া দিয়ে কত পানি গড়িয়ে গেছে। কেবল তুমিই আগের জায়গায় স্থির আছো। এজন্য গ্রামের মানুষের আচার-আচরণ দেখে তুমি অবাক হচ্ছো।

: ইয়ানূর, তুমি এত সুন্দর কথা শিখলে কোথায়?

: শিখতে হয়। এই দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে অনেক কথাই শিখতে হয়। চরকলমী এখন চর নেই। এখানে একদিকে নদীভাঙ্গা সহস্র পরিবার খেতে পায় না। অপরদিকে আরেকটা মহাজন শ্রেণীর দাদন ব্যবসা জমজমাট। তারা কত রকম আনন্দ উল্লাস করে যাচ্ছে। কচুখালীর ভেড়ি বাঁধের উপর গেছো?

: আসার সময় রাতে যা দেখেছি, পরে আর যাওয়া হয়নি।

: গেলে দেখতে এই ক্ষুদ্র বাজারে দু'টি টেলিভিশন। সবই চলে ব্যাটারীর সাহায্যে। তুমি কি ভাবতে পারো ওরা এত টাকা পায় কোথায়?

www.pathagar.com

: ইয়ানূর, তুমি দেখছি ভালই খোঁজ খবর রাখো।

: গ্রামের মেয়ে আমি। গ্রাম সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখব না?

: আমিও যদি তোমার মত এত খোঁজ খবর রাখতে পারতাম!

: ভাইয়া, তুমি যে বিগত তিন বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ, এই এক হাজার ছিয়ানব্বই দিনে কি আমাদের কথা একবারও মনে হয়নি?

: মনে হবে না কেন? অবশ্যই মনে হয়েছে। অসংখ্যদিন অসংখ্যবার মনে হয়েছে। গতবছরের এই দিনে খুব বেশি মনে পড়েছিল।

: এই দিনে আমরাও তোমার কথা বেশি ভেবেছি। যদি জানতাম যে তুমি বেঁচে আছো, পৃথিবীর যেখানেই থাকতে না কেন, আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করতাম।

: খুঁজতে গেলে তোমার খুব কষ্ট হতো এবং না পাওয়ারই সম্ভবনা ছিল বেশি।

: পেতাম না পেতাম তবু নিজেকে তো সান্ত্বনা দিতে পারতাম। আজ তোমার পাশে বসতে খুব খারাপ লাগছে। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। ভাইয়া, এতদিনে একটা চিঠি তো দিতে পারতে, পারতে না?

: নিরুদ্দেশ যারা হয়, তারা কারো সাথেই যোগাযোগ রাখে না। সিন্দাবাদ নাবিক, মহাকবি সেখসাদী, এমন কি হাজী মুহাম্মদ মহসিনও দীর্ঘ আঠার বছর নিরুদ্দেশ ছিলেন। তারা জগৎময় ঘুরে অসংখ্য কাণ্ড কারখানা দেখেছেন, বিপুল জ্ঞান হাসিল করেছেন।

: ভাইয়া তুমি নিজেকে হাজী মুহাম্মদ মহসিন ভাবো নাকি?

: হাজী মহসিন কি একজনই হতে পারে, অন্য কেউ পারে না?

: না, পারেনা। মহসিন হতে পারে না। অন্য কিছু হতে পারে। এই পৃথিবীর দু'জন মানুষ কখনো এক রকম হয় না। মানুষ মাত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। তোমার নিশ্চয়ই এবিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান আছে, আছে না?

: হ্যাঁ।

: সত্যি করে বলো তো, এতগুলো দিন তুমি কোথায় ছিলে?

: হ্যাঁ, সত্য কথাটা বলবো। সত্য কথা শুনতে হলে একটা শর্ত আছে।

: হাজারটা শর্ত থাকলেও আমি সত্য কথাই শুনব। এবার বল তোমার শর্তটা কি?

: শর্ত হচ্ছে কথাটা আর কাউকে বলা যাবে না। আমি যেভাবে গোপন রেখেছি ঠিক তুমিও রাখবে। পারবে তো?

: হ্যাঁ পারব। আমি মেয়ে মানুষ। মেয়েদের পেটে কথা হজম হয় না ঠিকই কিন্তু কথা দিচ্ছি — তোমার গোপনীয়তা আমি রক্ষা করব।

: আমি জেলে আটক ছিলাম।

: জেলে মানে!

: জেল-হাজত-কারাগার কি বুঝায় সেটা বুঝতে তো কারো কষ্ট হবার কথা নয়। আশা করি তোমারও হচ্ছে না।

www.pathagar.com

: জেলে গেছো ভাল কথা কিন্তু জেলখানা থেকে একটা চিঠি তো লিখতে পারতে, পারতে না? জওহরলাল নেহেরু তো জেলে বসেই অসংখ্য চিঠি লিখেছেন, Discovery of India নামের বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

: চিঠি দিতাম ঠিকই কিন্তু গ্রামের লোকজন মনে করতো, আমি নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছি। নতুবা পুলিশ আমায় ধরবে কেন? আর জেলওবা হবে কেন?

: পুলিশ ধরলেই অপরাধী হয় না। তারা যে কাউকে ধরে ১২০ দিনের ডিটেনশন দিতে পারে। একবার পত্রিকায় দেখলাম এক লোক বাইশ বছর জেল খাটল। বাইশ বছর পর দেখা গেল তার নামে কোন কেস নেই। এরকম বিনা বিচারে কতলোক জেলে পচে মরে! কত দুর্ভাগার জীবন-যৌবন সবই নিঃশেষ হয়ে যায়!

: আমার নামে কিন্তু কেস ছিল।

: ঘটনাটা খুলে বল।

: বলতে হবে?

: হ্যাঁ বলতে হবে।

: তাহলে শোন, তখন আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এক বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য কুমিল্লা গেলাম। বিয়েটা ছিল প্রেমের। এতে মেয়ের বাবা মা রাজি ছিল না। আমরা কিন্তু এত কিছু জানতাম না। আমরা দেখলাম কনে এসেছে। কনের সাথে আরো দু'তিনজন লোক এসেছে। যথারীতি কাজী এসেছেন। বিয়ের আসরে সকলে বসে গেছে। ঠিক তখনই মেয়ে পক্ষ লাঠিসোঠা নিয়ে হামলা করল। তারা আমাদের আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে মেয়ে গুম করার কেস দিল। মজার ব্যাপার কি জানো? মেয়েটি কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষে কথা বলল না। ফলে আমরা আরো ফেঁসে গেলাম। মেয়ের বাবা প্রভাবশালী ছিল বিধায় আমরাও তেমন সুবিধা করতে পারলাম না। আমাদের অর্থাৎ ছেলের বাবার তার চাচার ও আমার তিন বছরের জেল হল। আর সেই জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি এক সপ্তাহ আগে।

ইয়ানূর দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। মনে হয় সে কাঁদছে। কান্নার ধমকে তার গা কেঁপে উঠছে। রাশেদ বলল —

: ইয়ানূর, তুমি আজ কাঁদবে না। কান্নার অনেক সময় আছে। আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা কেবল হাসব। একবার কি হল জান, আমি তখন ছোট ছিলাম। এক বর্ষায় বন্যার পানি উঠে চারদিক টৈইটুম্বুর। সাদেক ভাই এসে বলল — চল রাশেদ, আমরা লেংডিয়ার বিলে যাব। সেখানে নাকি উজাইন্না বোয়াল উঠেছে। কোনভাবে একটা বোয়াল মারতে পারলে বীর পুরুষদের ইতিহাসে আমার নাম লেখা থাকবে। যেইমাত্র আমাদের ভেলাটা কচুখালীতে গেল, অমনি টানটান স্রোত তাকে পেয়ে বসল। ভেলা স্রোতের সাথে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। ভাইয়া শত চেষ্টা করেও সেটাকে সামলাতে পারছেন না। কাছাকাছি একটা নৌকা ছিল। আমাদের হাঁকডাক শুনে সে নৌকার মাঝি এগিয়ে এলো। যেইনা আমাদের ভেলাটা নৌকার সাথে ধাক্কা খেল, অমনি আমি জুপ করে পানির মধ্যে পড়ে

www.pathagar.com

গেলাম। সাদেক ভাই যেন আগে থেকে তৈরি ছিলেন, আমাকে উদ্ধারের জন্য সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই মামাতো ফুফাতো ভাই জড়াজড়ি করে প্রবল স্রোতের মধ্যে ভেসে থাকার চেষ্টা করছি, আর ঘূর্ণায়মান স্রোত আমাদের তলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। বোয়াল শিকার করতে গিয়ে আমরাই বোয়ালের শিকার হয়ে গেলাম হা–হা–হা।

: এসব থামাও ভাইয়া, এসব গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে।

: ঠিক আছে থামলাম। এবার উঠবে?

: উঠব। একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে ইয়ানূর বলল — এই জীবনে আমরা দু'জন একসঙ্গে নদীর কূলে দ্বিতীয়বার বসতে পারব, আমার মনে হয় না।

: আমরা কালই বসব। আমাদের বাঁধা দেয় কার সাধ্য!

: ভাইয়া এই জীবনটা খুব ছোট। একবার কোন ঘটনা ঘটে গেলে পুনরায় সেটি আর ঘটে না। একটি গাছ প্রতি ফাগুনে যৌবন প্রাপ্ত হয়, ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় সমস্ত গাছ। কিন্তু একজন মানুষের জীবনে একবারই যৌবন আসে।

: ইয়ানূর তুমি এত সুন্দর করে কথা বলতে জানো?

: কেন, আমি কি পড়াশোনা কম করেছি? নিজেকে তোমার যোগ্য বানানোর জন্য তো এই জীবনে কম সাধনা করিনি, কিন্তু পারলাম কোথায়?

ইয়ানূর আবার ডুকরে কেঁদে উঠল। রাশেদ হতভম্ব হয়ে তার কান্না দেখছে। কিন্তু সে কিছুতেই ইয়ানূরের কান্নার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। সে জানে যে ইয়ানূর বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। তিন বছর আগে রাশেদ যখন বাড়িতে এলো, তখন অভ্যাস বশত একবার ইয়ানূরদের বাড়িও গেল। তাদের তখন ভয়াবহ অবস্থা, তেতুলিয়ার স্রোত প্রবল। উথাল পাথাল ঢেউ, ছোট গ্রামটিকে গ্রাস করার জন্য বুভুক্ষু নদী যেন পাগলপাড়া। ইয়ানূরদের ঘরও প্রায় ভেঙ্গে যায় যায়। সে সকলের কাছ থেকে এই বলে বিদায় নিল যে, সামনে তার পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ করেই সে বাড়ি চলে আসবে। রফিক চাচা বললেন — পরীক্ষা শেষ করে আসতে আসতে বোধ হয় এবাড়ি থাকবে না। নতুন ভেড়িবাঁধ হচ্ছে। আপাতত ভেড়িবাঁধের পাশে একটা স্থান ঠিক করে রেখেছি। কোন উপায় করতে না পারলে প্রথমে সেখানেই ঘর তুলব। পরে দেখে শুনে অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করব। তুমি খুঁজলে আমাদের ভেড়িবাঁধের পাশেই খুঁজো।

রাশেদ বলল — চল ইয়ানূর, সেই বিকেল থেকে তো একটানা বসে আছি। এবার উঠা যাক।

রাশেদ উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু ইয়ানূর দাঁড়ালো না। সে আগের মতই মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাশেদ আবার বলল — রাত হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যাক। ইয়ানূর মুখ থেকে আচঁল সরিয়ে বললঃ ভাইয়া, তুমি আরো খানিকটা বসো। বাল্যকাল থেকে আমার কত সাধ ছিল, তোমার পাশে বসেই জীবনটা কাটিয়ে দেই। কিন্তু সেই সৌভাগ্য তো আমার নাও হতে পারে। এমনকি আজ যেভাবে অনেক্ষণ নদীর পাড়ে বসেছিলাম, আবার দু'জন একত্রে বসব আমার মনে হয় না।

www.pathagar.com

রাশেদ এর কোন প্রতিউত্তর করল না। সে ভাবল — মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অভিমানী হয়। এতদিন পর রাশেদকে দেখে কত দুঃখময় স্মৃতি তার মনে পড়েছে। সে হয়ত রাগ অভিমান ও আনন্দ সব কিছুর একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে। শীঘ্রই সকল ক্রন্দন আনন্দে রূপান্তরিত হবে। সে ইয়ানূরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে — সেদিনের সেই অবুঝ বালিকাটি কত বড় হয়েছে! ফ্রকপরা ছোট মেয়েটিকে আজ কত সুন্দর লাগছে!

চার.

হাটে বাজারে যাবার আগ্রহ রাশেদের কোনদিনই ছিল না। যেখানে লোকজন বেশি হৈ-হুল্লোড় বেশি সেস্থান এড়িয়ে চলাই ছিল তার স্বভাব। আজ কচুখালীর হাট। এক সময় ছিল নাগরপুরের হাট। চরকলমীর লোকরা লেংডিয়ার বিল পেরিয়ে নাগরপুর হাটে যেতো। এখন আর অত দূর যেতে হয় না। বছর তিনেক আগে এখানে নদী থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়। বাঁধ নির্মাণের সময় কচুখালীর প্রশস্ত খালের উপরও বাঁধ দেয়া হয়। বাঁধের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরই কলিমুদ্দিন নামের জনৈক লোক একটি মুদি দোকান খোলে। ক'দিনের মধ্যে ঐ দোকানে কেনাবেচা বেড়ে গেলে পার্শ্ববর্তী লোকরা আগ্রহী হয়ে আরো দোকান তুলতে থাকে। ধীরে ধীরে ইলিশ জালের মাঝিরাও এখানে এসে মাছ বিক্রি করে, এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিনে নিয়ে যায়। ফলে এক সময় এটি একটি বাজারে পরিণত হয়। এবং এলাকার লোকজন সবাই মিলে সপ্তাহে যাতে দু'দিন হাট বসে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হাট বসছে অনেক আগে থেকেই কিন্তু হাটের নামকরণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। কেউ বলে কচুখালির হাট আবার কেউ বলে ভেড়ির পাড়ের বাজার। হাটের নাম ঠিক না হওয়ার কারণ হল নদীর ভাঙ্গন। হয়ত চিন্তা ভাবনা করে একটা নাম দেয়া গেল। যেমন সরকারী কাগজে লেখা হল চরকলমীর হাট কিন্তু দেখা গেল বছর ঘুরে না আসতেই হাটটা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

বছর দুয়েক আগে নদীর ভাঙ্গন যত প্রবল ছিল, এখন তেমনটা নেই। সে রকম ভাঙ্গতে থাকলে ভেড়ি বাঁধ কবেই নদীর উত্তাল তরঙ্গে ভেসে যেতো। নদীর সেই ভাঙ্গন কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। তার অন্যতম কারণ হল — নাজীর পুরের পীর। গেল আষাঢ়ের আগের আষাঢ়ে তেতুলিয়া যখন মারমুখী আকার ধারণ করে গ্রামকে গ্রাম গ্রাস করে নিচ্ছিল, সাজানো গুছানো বাড়ি-বাগানগুলি যখন একের পর ধ্বসে যাচ্ছিল তখন লোকজন নাজীরপুরের পীর সাহেবকে নিয়ে এলো। পীর সাহেব তার বড় বড় খলিফাদের নিয়ে এলেন এবং একটানা তিনদিন একই স্থানে বসে কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ পীর সাহেবের দোয়া কবুল করেছেন। আর সে কারণেই নদীর প্রবল ভাঙ্গন প্রায় থেমে গেছে। এরপর থেকে প্রতি ছয়মাস অন্তর পীর সাহেব এখানে আসেন। তার সৌজন্যে প্রত্যেকবার এলাকার লোকজন চাঁদা তুলে শিন্নি সালাতের আয়োজন করে।

www.pathagar.com

আজ শুক্রবার। ভেড়ির পাড়ের হাট। সকালের দিকে কে যেন আজকের হাটের কথা বলেছিল। রাশেদ তার উত্তরে বলেছিল — সে হাটে যাবে না। হাটের অত হৈ-চৈ তার পছন্দ হয় না। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তার মতের পরিবর্তন হল। সে ভাবল — একবার তার হাটে যাওয়া উচিত। সে তো আর সিনেমার নায়ক নয় যে লোকজন তাকে ঘিরে থাকবে। তাকে এক পলক দেখার জন্য ছেলেপেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সে মূলত এখানে অচেনা। এই গ্রামে তার নিবাস ঠিকই। এটা কিন্তু স্বীকৃত নয়। যা স্বীকৃত তা হল বাবা মায়ের মত সে অনেক আগেই ইহধাম ত্যাগ করেছে। চার দিন আগে সে রফিক চাচার বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে এলো, দু'দিন পর সে বাড়িতে আবার গেল। পথে কত মানুষের সাথে তার দেখা হল। হাতেগোনা দু'চারজন ব্যতীত কেউ তাকে চিনেছে বলে মনে হলো না। একজন মৃত যুবক বাড়ি এসেছে, এক সময় যাদের অনেক ঐতিহ্য ছিল। ছিল দাদার অনেক কৃতিত্ব। তাকে এক নজর দেখার জন্য গ্রামের কৌতুলহী দু'চারজন লোকের ধেয়ে আসার কথা। রাশেদ খোয়াল করে দেখলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউই আসেনি। বাড়ির লোকজনও অসম্ভব প্রাপ্তির আনন্দে খুব একটা আনন্দিত হয়েছে বলে মনে হল না। তদুপরি নদী ভাঙ্গনে, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে করতে মানুষ যেন তাদের মনুষ্যত্বই হারিয়ে ফেলেছে। তারা হাসতে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে আশ্চর্যজনক কথা শুনে কিভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়। বেদনার প্রাবল্যে কিভাবে কাঁদতে হয়। তার আগমন বার্তা শুনে বিস্মিত হয়ে কলেজ হোস্টেল থেকে মাত্র একজন মানুষ ছুটে এসেছে যার নাম ইয়ানূর। যদিও সন্ধ্যার পরেই হাটের আসল কেনাকাটা শুরু হয় তবু রাশেদ খানিকটা আগে ভাগেই রওয়ানা হল। উত্তর ঘরের ছোট দাদীকে ডেকে বলল — দাদী, তোমার কিছু লাগবে কিনা? লাগলে চট করে বলে ফেলো। তুমি যেভাবে আমার আদর আপ্যায়ন করছো, তোমাকে একটা কিছু পুরস্কার দেয়া দরকার। দাদী এগিয়ে এসে বললেন — আমার পুরস্কার লাগবে না। তুমি সন্ধ্যার পর পরই চলে এসো, তুমিই আমার বড় পুরস্কার।

: কি যে বলো না দাদী! পুরস্কার তো পুরস্কারই, আমি তোমার পুরস্কার হতে যাবে কেন?

: হ্যাঁ নাতি তুমি আমার পুরস্কার। তুমি ফিরে এসেছো, আমি যে কি খুশী হয়েছি। তোমার দাদার কাছে আমার অনেক ঋণ। সে না থাকলে আমি কখনই এই বাড়ির বউ হয়ে আসতে পারতাম না। তোমার খেদমত করে সেই ঋণের একটা কিনারা করতে চাই।

: যার ঋণ তাকে শোধ দিও। এখন বল কি আনব?

: কিছু আনার দরকার নেই। আমার কাছে শ'খানেক টাকা আছে। এই টাকাটা নাও। তোমার হাত খরচের দরকার হবে।

: হাত খরচের টাকা আমার কাছে আছে।

: কোথায় পেলে টাকা?

: কেন, আমি এত দিন একেবারে বেকার ছিলাম নাকি? আমার ব্যাংক একাউন্টে কিছু টাকা জমা ছিল। আসার সময় সেটা নিয়ে এসেছি।

www.pathagar.com

: হ্যাঁ রে, কাল সন্ধ্যায় ইয়ানূর এলো, তোর সঙ্গে কি বিশেষ কোন কথা হয়েছিল..... ? না থাক। বলার দরকার নেই। মরা গরুর দাঁত দেখে আর লাভ কি ?

: মরা গরু মানে ?

: না, এমনিই বললাম। রফিক এক সময় কত স্বচ্ছল লোক ছিল, এখন পথের কাঙাল। তুই কি ওদের বাসায় একবার যাবি ?

: যেতেও পারি। ভেড়ির পাড়েই তো ঘর। যাবার সময় ঢু মেরে যাব।

: ঠিক আছে যা, তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু।

: কেউ ধরে না রাখলে অবশ্যই ফিরব।

রাশেদ আলমগীরের দোকানে এসে বসল। আলমগীর তাকে দেখেই চেয়ার এগিয়ে দিল।রাশেদ আলমগীরের আপন চাচাত ভাই না হলেও বাড়ির সম্পর্কে সে চাচাতো ভাই। তার পড়া শোনার দৌড় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও ব্যবসা পাতির দিক থেকে সে যথেষ্টে এগিয়ে। চরকলমীর হাটে যে কয়জন বড় ব্যবসায়ী আছে আলমগীরের অবস্থা তাদের সকলের চেয়ে ভাল। তার ঘরটাও সবার চাইতে উন্নত। বাজারে দু'টি টেলিভিশন, একটি আমিনুল্লা কোরানীর ছেলে বাবুলের অপরটি আলমগীরের। সারা হাটে মাত্র তিনটি হ্যাজাক লাইট জ্বলে তার একটি আলমগীরের দোকানে, দোকান মানে মুদি দোকান নয়। মহাজনী দোকান। যেখানে বসে লাখলাখ টাকার কারবার করা যায় কিন্তু সামান্য কিছু জাল বানানোর সুতা ছাড়া আর কোন মালামাল চোখে পড়ে না। ভেড়িরপাড় হাটের একটা পরিচালনা কমিটি আছে। আলমগীর হল সেই কমিটির সভাপতি।

আলমগীর বলল — ভাইয়া, আমি জানতাম তুমি বাজারে আসবে, এজন্যই আমি সকালে তোমাকে আসতে বলেছিলাম।

: কিভাবে বুঝলি ?

: মানুষের চোখ দেখে আমি তার মনের কথা বুঝতে পারি।

: তাই নাকি ?

: হ্যা, তাই।

: আচ্ছা আমার চেহারা দেখে বলতো আমি কি ভাবছি ?

: তুমি মনে মনে খুব লজ্জা পাচ্ছ। সকালে বলছিলে আসবে না অথচ এখন এসেছো।

: তোর আই কিউ খুব শার্প।

: ভাইয়া ?

: হ্যাঁ।

: তুমি এসেছো আমার খুব ভাল লাগছে। কি খাবে বল ?

: এলাম মাত্র। আসতে না আসতেই খেতে শুরু করব নাকি ? এলাম যখন অনেকক্ষণ বসব। তোর ব্যবসাপাতি দেখব। তারপর একটু চা মুখে দিয়ে বিদায় হব।

www.pathagar.com

: ভাইয়া, তুমি এসেছো নিজের খুশিতে, যাবে অন্যের খুশিতে। তুমি এখন আমার মেহমান। আমার ইচ্ছে হল — তুমি এখনই খাওয়া শুরু কর এবং খাওয়া শুরু হবে মিষ্টি দিয়ে।

উজ্জ্বল, এই উজ্জ্বল ! উজ্জ্বল নামের সার্বক্ষণিক দোকান দেখা-শুনাকারী যুবক এগিয়ে আসতেই আলমগীর বলল — যা, আমাদের জন্য লক্ষীর বাপের দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আয়। মিষ্টি আনার সময় লক্ষীর বাপকে বলবি দুইটালী দই চিনি দিয়ে রাখতে। মাগরীবের নামাজের পর দই দিয়ে নাস্তা খাব।

রাশেদের দিকে তাকিয়ে আলমগীর বলল — বুঝলে ভাইয়া, তুমি তো শহরে থাকো, খাটি দুধ দই পাওনা। আজ আসল দই খাবে। দেখবে এর মজাই আলাদা।

: এখানে কাপড়ের দোকান আছে নাকি রে?

: আছে। তোমার কোন কাপড় চোপড় লাগবে নাকি?

: আমার জন্য না। ছোট দাদীর জন্য একটা শাড়ী কিনতে হবে।

: দাদীর আবার শাড়ীর দরকার কি?

: দাদীকে একটা শাড়ী উপহার দিতে চাই।

: দাদীর শাড়ী পরার সময় কৈ? সারাদিন কাজ করে, মাটি-কাদা লাগে।

: কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরবে।

: ঠিক আছে, তোমার চিন্তা করতে হবে না, তুমি সময় মত শাড়ী পেয়ে যাবে।

ছোট একটি হাট। দোকানের সংখ্যা সব মিলিয়ে আট/দশখানা। সবগুলি দোকানই ভেড়ি বাঁধের উপরে। হাটবারে সবগুলি দোকান খোলা থাকলেও অন্য সময় তিন/চারটির বেশি খোলা থাকে না। এই হাটের একটি বিশেষত্ব এই যে, এটি ছোট হলেও এখানে একটি কাপড়ের দোকান, একটি জুতার দোকান আছে। নাগরপুর হাটে এত কিছু ছিল না। তখন কাপড়-জুতা-প্রসাধন সামগ্রী কিনার জন্য সদরে যেতে হতো।

রাশেদ বাজারে আসার পর গ্রামের কিছু লোক তার সাথে দেখা করতে এসেছে। রাশেদ তাদের সাথে হাশিমুখে কুশল বিনিময় করল। দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নাম সুলতান আহাম্মদ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি বললেন —

: আপনি তিন-চার দিন আগে এক সকালে স্কুলে গিয়েছিলেন। আমি সেদিন ছুটিতে থাকায় আপনার সাথে দেখা হয়নি।

: তাতে কি ! আজতো দেখা হল।

: আপনি এসেছেন ভালই হল। সমাজের কিছু পরিবর্তন দরকার। সব কিছু কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। আপনার হস্তক্ষেপে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথাই ধরুন.....।

: এর জন্য তো আপনিই যথেষ্ট। চারজন শিক্ষক। তিনজন বাদ দিলেও আপনি তো এই গ্রামের মানুষ। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নিশ্চয়ই আপনার করণীয় কিছু আছে। আছে না?

www.pathagar.com

: তা আছে। কিন্তু আমি তো প্রধান শিক্ষক নই। ধরুন আমি একটা উদ্যোগ নিলাম, হেডমাষ্টার সেটার প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না। তাহলে তো আমার শ্রমই ভেস্তে গেল।

: সব শ্রম ভেস্তে যায় না। আপনি যদি মানুষকে মটিভেট করতে পারেন, তবে মানুষ আপনার কথা শুনবে না কেন?

: বয়স হয়ে গেছে। এখন কি আর হৈ চৈ করার মত শক্তি আছে?

: বয়সের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। আমার দাদাকে দেখেছি বুড়ো বয়সেও তিনি অকাতরে মানুষের জন্য খেটেছেন।

: আপনার দাদার মৃত্যুর পর তো চরকলমী অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনি আপনার দাদার দায়িত্ব নেন, আমরা আপনার পিছনে থাকব।

: সেটা কি হয়! আমি তো ক'দিনের অতিথি মাত্র। আজ আছি কাল নেই।

: আপনি কি আবার চলে যাবেন?

: নয়তো কি! এখানে আলমগীর আছে, আপনারা আছেন, আপনারাই দেখুন। গ্রাম্য রাজনীতি আমি বুঝি না। এসবে জড়ালে নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এই ধরুন আমি আপনাদের স্কুলের জমিজমা বা অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে গেলাম, অমনি কিছু লোক আমার দিকে চোখ বড় করে তাকাবে। হেডমাষ্টার বলবেন — উনি তো স্কুলের কেউ না, উনি এখানে নাক গালাতে আসেন কেন ইত্যাদি।

: কাজ করতে গেলেই সমস্যা হয়। আপনার জন্য সুবিধা এই, আপনি সকলের সহযোগিতা পেতেন। সবাই আপনার কথা শুনতো।

: লোকজন আমার কথা শুনবে তার তো কোন গ্যারান্টি নেই। অনেকে তো আমাকে চিনেই না।

: চিনে ঠিকই কিন্তু কথা বলতে সাহস পায় না। আপনি জীবিত আছেন, সশরীরে ফিরে এসেছেন এটা চরের সব মানুষের মুখে মুখে। তারা যে কত খুশি হয়েছে!

: আলমগীর বলল — মাষ্টার সাহেব চা নেন, চায়ে চিনি লাগলে বলবেন।

রাশেদ, আলমগীর, সুলতান মাষ্টার ও বাজারের আরো তিনচারজন লোক চা খাচ্ছিল। এর মধ্যে রফিকুল ইসলাম এসে ঢুকলেন। রাশেদকে বললেন — হাটের শেষে তুমি আমাদের বাসায় যাবে নাকি? গেলেতো কিছু মাছ তরকারী কিনতে হয়।

মাষ্টার সাহেব বললেন — রফিক ভাই, রাশেদের সাথে আমরাও আপনার বাসায় আমন্ত্রিত। আপনি কি রাজি? আলমগীর বলল — চাচা, রাশেদ ভাইয়ের সাথে আমিও যাব। রফিকুল ইসলাম বললেন — যেতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু ভেড়ির পাড়ে এতটুকুন ঘর, তোমাদের যে বসতে দিব, সেই স্থান কোথায়।

আলমগীর বলল — ঠিক আছে আজ তাহলে মুক্তি দেয়া গেল। আপনি একদিন আমাদের দাওয়াত করবেন। দরকার হয় আমরা ভেড়িবাঁধের উপর বসেই খেয়ে আসব। রফিকুল ইসলাম বললেন — সে রকম একটা কিছুর আয়োজন হবে। তোমাদের সবাইকে তখন বলব।

www.pathagar.com

মাষ্টার সাহেব বললেন — আমরা কিন্তু সেই অপেক্ষায় থাকলাম। রাশেদ বলল — চাচা আজ আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি কাল সকালে আপনার বাসায় যাব।

সন্ধ্যার পর রাশেদ বাড়ির দিকে রওয়ানা হবে ঠিক সে মুহূর্তে অর্ধবয়সী একজন লোক তার দিকে এগিয়ে এলো। সে রাশেদকে দেখে মনে হলো সপ্তাশ্চার্যের কিছু একটা দেখে ফেলেছে। সে কাছে এসে রাশেদকে জড়িয়ে ধরল এবং কেঁদে উঠল। অথচ রাশেদ এখন পর্যন্ত লোকটিকে চিনতেই পারল না। লোকটির কান্না থামার পর রাশেদ বলল —

: কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তো চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু পুরোপুরি চিনতে পারছি না।

: না চিনারই কথা। ইলিশ জালে কাজ করে প্রায় বুড়িয়ে গেছি। তাছাড়া দাঁড়ি থাকাতে চিনতে আরো কষ্ট হচ্ছে। আমার নাম হাশু। নাগরপুরের হাশু। হাইস্কুলে একসাথে কিছুদিন পড়েছিলাম, বাবার মৃত্যুর পর আর লেখাপড়া হল না।

রাশেদ অবাক হয়ে বলল — তুই কি সত্যই সেই হাশু?

: সন্দেহ নাই, আমি সেই হাশু।

: তুই তো একেবারে বুড়ো হয়ে গেছিস রে।

: বুড়ো হবার কারণ তো আগেই ব্যাখ্যা করলাম?

: তুই কি শুনেছিলি যে আমি মরে গিয়েছিলাম।

: শুনেছি বলেই তো তোকে দেখে এত অবাক হলাম।

: অবাক হওয়ার কি আছে! মানুষকে তো এক সময় মরতেই হয়।

: মরে মরুক, তাতে আফসোস নেই। কিন্তু একজন মরে অন্যদের অকূল দরিয়ায় ভাসিয়ে রেখে যায় — সমস্যা সেখানেই।

: কারো সমস্যার জন্য মানুষের জন্ম-মৃত্যু ঠেকে থাকে না। সেগুলো সময় মত হয়। আমাকে জন্ম দিয়েই মা ইহধাম ত্যাগ করবেন, আমার উপর মহাদুর্যোগ নেমে আসবে, সেজন্য তো মৃত্যু থেমে থাকেনি। এখন এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না। এখন বল তোর বউ-বাচ্চা কেমন আছে? খালাম্মা কেমন আছেন?

: ভাল। কিন্তু আমি যে বিয়ে করেছি, তুই জানলি কিভাবে?

: তোর বয়স আশির কাছাকাছি, বিয়ে না করলে এমন অবস্থা হল কিভাবে?

: তা ঠিক। তবে বউটা খুব ভাল। আমার দু'টো মেয়ে, তারাও তাদের মায়ের মত। তুই আয় না একদিন আমাদের বাড়ি। মা এখনো আছেন। তোকে দেখলে মা খুব খুশি হবেন।

: খালাম্মা আছেন নাকি এখনো?

: আছে।

: তা হলে তো একবার যেতেই হয়। যে ইলিশ জালে কাজ করিস, সেটা কি নিজের নাকি অন্যের সাথে মাসিক বেতনে কাজ করিস?

: নৌকা পাব কোথায়। কেয়ারা নৌকা চালাই। দাদনে জাল নিয়েছি, সেটার জন্য প্রতি সপ্তাহে ডিউ দিতে হয়।

: এখানে দাদন ব্যবসাটা বোধ হয় খুব জমজমাট।

www.pathagar.com

: শুধু এখানে কেন, নদীতে যত জাল আছে তার বারআনাই দাদনে নেয়া। প্রাচীন কালে ইহুদীদের মত এখানকার মহাজনরাও সুদের উপর কাজ করে।

আলমগীর এতক্ষণ পর বলল — অন্যের সমালোচনা করে লাভ কি। টাকা থাকলে প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ করে। দাদনে টাকা খাটানো এটাও এক ধরনের ব্যবসা।

রাশেদ বলল — ব্যবসা ঠিকই কিন্তু যতদিন এই সুদভিত্তিক কারবার বন্ধ না হবে ততদিন মানুষের উন্নতি অসম্ভব। এই অন্যায়টা আমাদের রক্ত মাংসের সাথে এভাবে মিশে গেছে এটা যে এক ধরনের জুলুম এটাও আমরা জানি না।

হাশেম বলল — থাক এসব। সারা দেশে দুর্নীতি দু'একটা নিয়ে কথা বলে লাভ কি! তারচে বলো তুমি আসবে কবে? সঠিক তারিখ জানালে আমি সেদিন নায়ে যাব না।

: সেই ছোট বেলায় তোদের বাড়িতে গেছি। পথঘাট চিনতে পারব কিনা কে জানে!

: নাগরপুর যাওয়া এখন খুব সহজ। ভেড়িবাঁধের উপর দিয়ে হাটতে শুরু করলে নাগরপুর পেয়ে যাবে।

: কিন্তু আমিতো যাব লেংডিয়ার বিলের মধ্য দিয়ে। সেদিন রাতে বাড়ি আসার সময় ওখান দিয়ে এসেছি। অন্ধকার রাত, খুব ভয় পেয়েছিলাম। দিনের বেলা গিয়ে একটু দেখা দরকার ভয়ের সত্যিই কোন কারণ আছে কিনা।

: আমি দু'দিন বাড়ি থাকব, যদি এর মধ্যে আসতে পার তাহলে খুব ভাল হয়।

: আমি পরশু আসব। দুপুরের আগেই চলে আসব। তুই তৈরি থাকিস।

রফিক চাচার ঘর প্রাচীন আরব বেদুঈনদের সেই পর্ণকুটিরের মতো যার চাল মাথায় ঠেকে যায়। কিংবা সেই ছোট তাবুর মত যাতে ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। আজও রাশেদ রফিক চাচার ঘরে ঢুকতেই চালের আড়া মাথায় লেগে গেল। সুফিয়া বেগম হা-হা করে উঠলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন — ব্যথা পেয়েছো নাকি বাবা? রাশেদ বলল, নাহ! ব্যথা পেলে তো ফুলে উঠতো।

: কি করব বাবা। এখানে এর চেয়ে উঁচু ঘর তোলা যায় না। ঘর বড় করতে হলে আরো জায়গা লাগে। সেজন্যে আরো নিচে যেতে হয়। নিচে বৃষ্টির পানি উঠে। একদিকে চাইলে আরেক দিক হয় না — এই অবস্থা!

: বিপদ তো সকলের জন্যই সমান। যে লোক নদীতে পড়ে তার বেঁচে থাকাটাই মুখ্য। পোশাক কোথায় গেল সেটা বিবেচ্ছ বিষয় নয়।

: তুমি কি সকালের নাস্তা সেরে এসেছো নাকি খাবার দিব?

: আমি খেয়ে এসেছি।

: খালাম্মা, ইয়ানূর কোথায় ইয়ানূরকে দেখছিনা যে?

: এই তো একটু বাইরে গেল। এক্ষুণি এসে পড়বে। তুমি একটু বসো, আমি পিঠা দিচ্ছি, তুমি আসবে ভেবে গতরাতে পিঠা বানিয়ে ছিলাম।

যে রাতে রাশেদ প্রথম এ ঘরে এসেছিল সে রাতে কোন পার্টিশন ছিল না। পুরো ঘরটাকে একটা হল ঘরের মত মনে হয়েছিল। এখন হোগলা পাতা দিয়ে পার্টিশন দেয়া হয়েছে। মধ্যখান দিয়ে চারটি বেড়া দেয়ার ফলে রুমগুলি খুব ছোট হয়ে গেছে। মনে হয়

www.pathagar.com

কেউ শুলেই পা মাথা বেড়ার সাথে লেগে যাবে। এক সময় জাপানে এই সিস্টেম চালু ছিল। তখন ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র কারখানা ছিল। সেই কারখানায় মা বাবা, ভাই বোন সকলে এক সাথে কাজ করতো। যখন রাত হতো তখন কাগজের পার্টিশন টানিয়ে দেয়া হতো। সকালে খুলে আবার তারা কারখানার কাজ শুরু করতো। সেই ছোট ঘরগুলি ছিল সম্পদ উৎপাদনের কেন্দ্র। আর আমাদের ঘরগুলি এখন বিকলাংগ পুষ্টিহীন সন্তান উৎপাদনের কেন্দ্র।

রফিক চাচার ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। তার ঘরে এমন দু'জন মেহমান এসেছে যারা চরকলমীর গৌরব। একজন অর্নাস পর্যন্ত পড়েছে, অন্যজন বি.এ পাস করার জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। এই দু'জন শিক্ষিত লোককে থাকতে দেয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত সুন্দর দুটি রুম তো চাইই। যদিও তার অবস্থা শোচনীয় এবং অর্থকড়ি নেই তবু রুচিবোধ তো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি!

পিঠা হাতে হাসতে হাসতে ইয়ানূর এলো। বলল —

: কাল সারা দিন তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। ভাইয়া, তুমি এলে না কেন?

: কাল আসিনি, আজ তো এলাম।

: নাও, পিঠা নাও। ভাগ্য খারাপ। তোমাকে বাসি পিঠা খেতে হবে।

: তোমার হাতের পিঠা বাসি হলেও ভাল লাগবে।

রাশেদ একটি পিঠা তুলে নিয়ে মুখে দিল, ইয়ানূর ভাবলো — রাশেদ ভাইয়া, এই জীবনে বাসি পিঠাও তোমার কপালে জুটবে না। তুমি এমন কাজ করেছো যার জন্য তুমিও সারা জীবন কাঁদবে, আমাকেও কাঁদাবে। রাশেদ বলল —

: তুমি খাচ্ছো না যে? মনে হয় কিছু একটা ভাবছো?

: নাহ! ভেবে আর কি হবে!

: তোমার মুখে বিষাদের ছায়া। আমাকে দেখে তুমি কি খুশী হওনি?

: ভাইয়া, কলেজে আমার টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। তুমি ফিরে এসেছো শুনে ছুটে এলাম। আর তুমি বলছো আমি খুশি হইনি। আমি খুশী না হলে কে হবে?

: আমি তো তা-ই জানি।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য ইয়ানূর প্রশ্ন করল —

: আচ্ছা ভাইয়া, এক সময় আমাদের কাজ করতো যে মনার বাপ তার কথা কি তোমার মনে আছে?

: মনে থাকবে না কেন? কি হয়েছে মনার বাপের?

: নাহ, কিছুই হয়নি। তুমি কি কখনো ওদের বাড়িতে গিয়েছিলে?

: গিয়েছিলাম মনে হয় একবার।

: আমাদের এই ঘরটা তার সেই ঘরের মত ছোট, তাই না!

: তার চেয়েও শোচনীয় বলতে পার। তার ঘরে চৌকি ছিল। আমরা তার মেয়ের বিয়েতে গেলে আমাদের চৌকিতে বসতে দিয়েছিল। এখানে সেটাও নেই।

www.pathagar.com

: তোমাকে যে সম্মান করে একটু বসতে দিব সেই অবস্থাও আমাদের নেই।

: সেই অবস্থা কি আমার আছে? আমাদের দু'টি পরিবারই নদী ভাঙ্গনের শিকার। আগুনে পুরলে ভিটা থাকে। পানিতে ধরলে কিছুই থাকে না। অথচ এই পানিরই অপর নাম জীবন।

: কথা বললে পিঠা খাওয়া হবে না। তুমি পিঠা খাও। আমি একটু আসি।

: তুমি গেলে মোটেই খাওয়া হবে না। তার চেয়ে তুমি বসো। খাওয়াটা আসল উদ্দেশ্য না। আসল উদ্দেশ্য কিছু কথা বলা। সাহিত্যের অলংকার যেমন কথাকে মাধুর্য মণ্ডিত করার জন্য একটি সহায়ক শক্তি তেমনি এই পিঠাও একটি সহায়ক, যা কথাকে পূর্ণতা দান করে।

: ভাইয়া, তুমি উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ। তোমার সাথে কথায় পারা যাবে না।

: ইয়ানূর, তুমি বস। স্থির হয়ে বস। আমি একটি প্ল্যান করেছি, প্ল্যানের কথাটা প্রথম তোমাকে শোনাবো। তোমার সম্মতি পেলে অন্যদের শোনাবো। গতরাতে শুয়ে শুয়ে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছি। তুমি কি শুনবে?

: আমাকে শুনিয়ে লাভ কি?

: লাভ কি মানে? কথা শোনার মত আমার আর কে আছে?

: বল, আমি শুনছি।

: আগ্রহ কম থাকলে এখন থাক, পরে বলব।

: বলতে চাচ্ছো যখন বলে ফেলো।

: তোমার কি খেয়াল আছে — আগে যেখানে আমাদের কাঁটাবাগান ছিল সেখানে এখন ভেড়ি বাঁধ?

: হ্যাঁ খেয়াল আছে। তোমাদের বাড়িতে তো একবার দুইবার যাইনি, অসংখ্যাবার গেছি, সবকিছুই আমার মনে আছে।

: সেই কাঁটাবাগান বরাবর পূর্ব পাশে আমাদের বেশ কতটুকু জমি আছে। আমি সেই জমির উপর ঘর তুলতে চাই। ঘর তুলতে যতটা দেরি হয়, ততটা অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে সে ঘরে নিয়ে তুলব।

: ঘর তুলতে অনেক টাকার দরকার হবে। এত টাকা পাবে কোথায়?

: আমার পরিকল্পনাটা তোমার পছন্দ কিনা? টাকা কোন সমস্যা না।

: টাকাই সমস্যা। টাকা থাকলে আমাদের এভাবে খাস জমিতে খড়ের ঘর বানিয়ে থাকতে হতো না।

: টাকার একটা উৎস আছে।

: উৎসটার কথা আগে বল।

: আলমগীরের কাছ থেকে লাখ খানেক টাকা ধার নিব।

: ধার নিবে? তাও আবার আলমগীরের কাছ থেকে?

: মনে হয় তুমি অবাক হচ্ছো?

: অবাক হওয়ার মত কথাই তো। অবাক হব না?

www.pathagar.com

: আলমগীর আমার বাড়ির ছেলে এবং চাচাতো ভাই।

: সেটা আমিও জানি, আর এও জানি আলমগীর নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝে না। তুমি গ্রামে থাকো আর গ্রামের সকল নেতৃত্ব তোমার হাতে চলে আসুক — এটা সে কখনই চাবে না। ভাইয়া তোমার সমস্যা কি জানো? তুমি খুব সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলো। তলিয়ে দেখতে চাও না আসলে কে কেমন।

: তুমি কি চাও না আমি গ্রামে থেকে যাই এবং সমাজের কোন উপকারে আসি?

: চাবো না কেন? তবে তুমি টিকতে পারবে বলে মনে হয় না।

: টিকবো না কেন?

: টিকতে হলে অনেক অর্থ দরকার। সমাজের উপকার করতে হলেও অনেক ক্ষমতা দরকার। এর কোনটাই তোমার নেই। এর অর্থ এই নয় যে, আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করছি। বরং একটা কথা জেনো — আমাদের সমাজে মানুষের মূল্যায়ন হয় অর্থের মাপকাঠিতে। আরো ক'দিন গেলেই বুঝতে পারবে মানুষ তোমার চেয়ে আলমগীরকে বেশি মর্যাদা দেয়। এটা তোমার সহ্য হবে না।

: আলমগীর তো আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে, আমাকে উচ্চ আসন দিয়ে নিজে নিচু আসনে বসে।

: অল্প ক'দিন এ অবস্থা চলবে। যেহেতু লোকজন তোমাকে অনেকদিন পর দেখেছে, তারা তোমার কাছে আসছে। তোমার কুশল জানতে চাচ্ছে। লোকদের এই সম্মানকে উপেক্ষা করার শক্তি তার নেই। তুমি কাল আলমগীরের দোকানে বসেছো, দই খেয়েছো এসব কেন সে করেছে জানো? লোকদের দেখাচ্ছে সে তার চাচাতো ভাইকে সম্মান দেখাচ্ছে। পরে সে যখন তোমাকে অপমান করবে সেটা কিন্তু তারা তলিয়ে দেখতে আসবে না।

: তুমি বলতে চাও, তার কাছে টাকা চাইব না?

: চাবে না কেন? দরকার হলে অবশ্যই চাবে। চাইলে সে নিষেধ করবে না। তোমাকে গছাতে পারলে বরং সে-ই বিজয়ী হবে। এরপর কোনদিনই তার উপর দিয়ে তুমি কথা বলতে পারবে না।

: কিন্তু আলমগীর আমাকে কি প্রস্তাব দিয়েছে জানো?

: কি প্রস্তাব দিয়েছে?

: প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই যে দৈন্যদশা, আমি স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকলে এ অবস্থাগুলোর পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া বলেছে ভেড়িবাঁধের পূর্বপাশে নিজ জমির উপর বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে। টাকা যা লাগে সে দিবে। প্রস্তাবটা আমারও পছন্দ। অনেক বছর তো বাইরে ছিলাম। এবার থেকে গ্রামে থাকি। সংসার জীবন শুরু করি। কি বলো?

: ভাল কথা, বাড়ি কর, সংসারী হও। এতে আমার আপত্তি থাকার প্রশ্নই উঠে না, তবে আলমগীরকে আমার ভাল মনে হয় না — এটাই আমি বুঝাতে চাচ্ছি।

: আলমগীরের বিরুদ্ধে তোমার এত বিষোদগার কেন, এটা বুঝা গেল না।

www.pathagar.com

: আলমগীর একজন সুদখোর ব্যবসায়ী। দাদনে অর্থ খাটানো যার প্রধান কাজ, সে বিনা লাভে তোমাকে অর্থ দিবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। এছাড়া তোমাকে এখানে রাখতে পারলে তার লাভ আছে।

: কি ভাল?

: তার একজন প্রতিপক্ষ আছে। আমিনুল্লা কেরানীর ছেলে বাবুল। সে তোমাকে দিয়ে তাকে পদানত করতে চায়। তার দুরভিসন্ধি তুমি বুঝবে না। তুমি যদি বুঝতেই আমাকে এত কাঁদতে হত না।

ইয়ানূরের ছোট দুইভাই পিপলু ও বাবলু স্কুল থেকে ফিরল। ইয়ানূর বলল — ভাইয়া, তুমি এদের নিয়ে গল্প কর। আমি দেখি তোমার জন্য কিছু তৈরি করা যায় কিনা।

পাঁচ.

নাগরপুর বাজার সংলগ্ন বিশাল এক দীঘি। দীঘির নাম কমলার দীঘি। দীঘির এক পাশে ছিল বিরাট টিনের দু'টি কাচারী। ইংরেজ আমলে এখানে বসে কালারায়ের জমিদারীর খাজনা তোলা হতো। দীঘির অপর পাশে নাগরপুর বাজার। এলাকাটা হয়ত এক সময় জমজমাট ছিল। ক'বছর আগেও নাগরপুরে হাট বসতো, এখন বসে না। কাচারী দু'টি স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মৌলবী আহমদুল্লাসহ ক'জন মুক্তিযোদ্ধা এতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে আছে সেই পরিত্যক্ত কমলার দীঘি আর নাগরপুর বাজারের মস্ত এক বটগাছ। এই দু'টি নিদর্শনই প্রমাণ করছে — এক সময় এই এলাকার প্রচুর মর্যাদা ছিল। সমস্ত ঐতিহ্য কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে।

রাশেদ আজ হাশিমদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। সে এর আগে এবাড়িতে মাত্র দু'বার এসেছিল। সেও প্রায় বাল্য বয়সের ঘটনা। অথচ হাশুর মা তাকে ঠিক মনে রেখেছেন। বাড়িতে পৌঁছতেই হাশুর মা রাশেদকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। মনে হলো রাশেদও তার ছেলে, অনেক বছর পর তিনি তার হারানো ছেলেকে পেয়ে কান্না সংবরণ করতে পারেননি।

রাশেদ তার মাকে দেখেনি। একটি মাত্র শিশু সন্তানের জন্ম দিয়ে ঔষধি গাছের মত তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ঘরে এমন কোন ছবিও তুলে রাখা হয়নি, যেটা দেখে রাশেদ অনুমান করবে তার মা কেমন ছিলেন। সেকালে হয়ত এ নিম্নাঞ্চলে বিয়ের সময় ছবি তুলে রাখার নিয়ম ছিল না। রাশেদের মা ছিল কৈবর্তদের মেয়ে। দেবিপুরের কাছে ঐতিহ্যবাহী মিজাকালু স্কুল, বাবা যখন সেই স্কুলের ছাত্র তখন কৈবর্তপাড়ায় তার খুব যাতায়াত ছিল। বিশেষ করে তার শিক্ষক অনন্ত চন্দ্রপালের কাছে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অনন্ত চন্দ্র ছিলেন মির্জাকালু স্কুলের নামকরা অংকের শিক্ষক। সেই যাতায়াতের সুবাদে অনন্ত চন্দ্রের মেয়ে জোছনার সাথে তার বাবার মন দেয়া নেয়া হয়। মাধ্যমিক স্কুলের সীমানা

www.pathagar.com

অতিক্রমের পূর্বেই তাদের প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে যায়। অনন্ত পাল মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। যদিও জোছনা ধর্মান্তরীত হয়ে একজন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছিল। অনন্ত পালের আপত্তি না করার অন্যতম কারণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা। কৈবর্তরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের। ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বারা তারা সর্বদাই ছিল অবহেলিত। তার স্কুলে চাকরী করার ব্যাপার নিয়েও হিন্দুদের ঘোর আপত্তি ছিল। সবচে বড় দুর্ভাগ্য ছিল অনন্ত পণ্ডিত যে হিন্দু ছেলেদের আগ্রহ করে অংক শিখাতেন তারাও তাকে ঘৃণা করতে কার্পণ্য করতো না। এজন্য যখন তার মেয়ে একজন মুসলমান ছেলের হাত ধরল তখন তিনি সানন্দে সেটা মেনে নিলেন। রাশেদের দাদাও ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিলেন। চরকলমী এবং দেবিপুরের হিন্দু মুসলমান সকল লোককে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন। এমন কি মির্জাকালু স্কুলের দপ্তরী পর্যন্ত সেই নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়ল না। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সেই বিয়েতে অনন্ত পণ্ডিত ছাড়া স্কুলের অন্য কোন হিন্দু শিক্ষক অংশ নিল না। এই ঘটনা চরকলমীর এক ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস। রাশেদ বড় হওয়ার পর দাদী পারিবারিক এসমস্ত কাহিনী তাকে বলে যান।

রাশেদ যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন তার বাবার মৃত্যু হয়। এবং দেখতে দেখতে পরিবারের অপর সদস্যরাও ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে। রাশেদের মাথার উপর বাল্যকাল থেকে যে ছাদ ছিল সেই ছাদ এক সময় সম্পূর্ণরূপেই খসে পড়ল। ওদিকে অনন্ত পন্ডিতও স্ববংশীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যান।

প্রকৃতি রাশেদের উপর এত নির্মম — মাঝে মাঝে সে ভেবে খুব অবাক হয়। জগৎ সংসারে মানুষ কিভাবে এরকম একা হয়, সেটা তার বুঝে আসে না। বাপ না থাকলে বাবার ভাই থাকেন। মা না থাকলে খালা থাকেন। যাদের স্নেহে লালিত হয়ে তাদের প্রতিকৃতি দেখে অনুমান করা যায় বাবা কিংবা মা কেমন ছিলেন।

রাশেদ ঢাকার জীবনে এক ছেলের সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে কেবল মায়ের পরিচয়ে পরিচিত। আমাদের দেশের কাগজপত্রে যেখানে নিজের নামের সাথে পিতার নাম উল্লেখ করতে হয়, সেখানে সেই ছেলেটি ব্যবহার করতো তার মায়ের নাম। ছেলেটির সঙ্গে এক সময় রাশেদের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং রাশেদকে সে তার পারিবারিক কিছু তথ্য প্রদান করে। ছেলেটির নাম আব্দুল্লাহ। তার মা ছিল এক ক্যাবারের নর্তকী। সেই নর্তকী একটি অবৈধ সন্তান জন্ম দানের পর রঙিন জগত থেকে বহিস্কৃত হয়। তার মা সেই মুখোশধারী ভদ্রলোকদের নৃত্যশালা থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটি বস্তিতে আশ্রয় নেন। তারপরের দিনগুলি আরো করুণ, আরো ভয়াবহ। তবু তিনি শিশু পুত্রকে কোলছাড়া করেননি। ধীরে ধীরে তিনি তার ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান এবং বড় করে তোলেন। সেই পিতৃপরিচয়হীন আব্দুল্লারও একজন মা ছিল। এবং সে সব সময়ই মায়ের স্নেহ ও আশীষ লাভ করতো। অথচ রাশেদের এক সময় সবই ছিল, আজ কেউ নেই। তিন বছর সে জেলে ছিল। এই তিন বছরে সকলের এই ধারণা পোক্ত হয়েছে যে, রাশেদ নামের একটি অনাথ ছেলে কত আগেই তো পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে। অথচ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে কেউ তাকে একটু খুঁজে বের করার চেষ্টাও করেনি।

www.pathagar.com

প্রতিটি সন্তানের জীবনে মা-বাবা কত বড় সম্পদ, কত স্নেহের ভাণ্ডার — রাশেদ পদে পদে সেটা উপলব্ধি করেছে। বাবা-মা সন্তানের জন্য ভালবাসার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। যে স্নেহের রাজত্ব থেকে ছেলেমেয়ে মানুষ হয়, আপন-পর চিনতে পারে। একজন পিতৃপরিচয়হীন বালকও সকাল-সন্ধ্যায় তার মায়ের সান্নিধ্য লাভ করে। তার স্নেহ লাভে ধন্য হয়। অথচ কি ভয়ংকর এই সংসার যে কেবল রাশেদের কপালেই সেটা জুটলো না। হায় পৃথিবী ! এই সংসারে তোমার নিষ্ঠুর খেলা আর কত কাল চলবে !

সারা উজান অঞ্চলে নাগরপুর খুব বিখ্যাত গ্রাম। সারা উজান অঞ্চলের ঐতিহ্য যদি কিছু থাকে, সে আছে এই গ্রামেই। এই গ্রাম থেকে নদী এখনো বেশ দূরে। নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলেও আরো পাঁচ বছরেও নদী এই গ্রাম স্পর্শ করতে পারবে বলে মনে হয় না। আর স্পর্শ করলেই বা কি, যে নদীরই সন্তান সেই নদীই একদিন তাকে গিলে ফেলবে। এতে আশ্চর্যের কি আছে ! শোল মাছের বাচ্চা যখন বড় হয় তখন নাকি মা-শোল নিজেই বাচ্চাদের গিলতে শুরু করে। সন্তানরা তখন জীবনের ভয়ে অন্যত্র চলে যায়। এবং নিজেরাই স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করে। এক সময় এই অঞ্চলে ছিল প্রবাহমান নদী, উথাল পাথাল ঢেউ, আর কলকল শব্দ। পরবর্তীকালে তেতুলিয়া ও মেঘনার মধ্যস্থানে চর জাগে। সেই ভাসান চরে এসে চাষীরা ফসল বোনে। দেখতে দেখতে গাছ উঠে। পাখি আসে, শিয়াল ডাকে। অবশেষে মানুষ এসে সেখানে বসতি স্থাপন করে। একটি গ্রাম্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এটা মাত্র একশ' বছর আগের কথা ।

নাগরপুরে জমিদারদের কোন আবাসিক বাড়ি ছিল না। তবে এখানে যে বিশালকায় দু'টো টিনের বাড়ি ছিল তার একটিতে খাজনা আদায় করা হতো। অপরটি ব্যবহৃত হতো জমিদারদের বাসা-বাড়ি হিসেবে। অর্থাৎ জমিদার কালারায় এখানে স্থায়ীভাবে বাস না করলেও জমিদারী তদারক করার জন্য ঐ পরিবারের কেউ এলে এখানেই উঠতেন। এখন এই এলাকায় প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আছে কমলার দীঘি, একটি ছোট শিব মন্দির ও একটি অতিকায় বটগাছ।

কমলার দীঘি নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক কাহিনীর প্রচলিত। কমলা নাকি জমিদার কালারায়ের কন্যা ছিলেন। জমিদারী ক্রয়ের কয়েক বছর পর এক গ্রীষ্মে কালারায় এখানে এলে শুনতে পান যে, মহামারী লেগে গ্রামকে গ্রাম বিরাণ হয়ে গেছে। শত শত মানুষ অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কলেরা, গুটি বসন্ত, কালাজ্বর ইত্যাদি প্রতিরোধের কোন অবস্থা ছিল না। কালারায় সারা অঞ্চল ঘুরলেন। তিনি ভাবলেন, তার রাজত্বে প্রজাই যদি না থাকে তবে তিনি কিসের রাজা ! তিনি তখন সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য নিজের অপরূপা কন্যা কমলার নামে দীঘি খনন শুরু করলেন। সুদীর্ঘ দশবছর ধরে খনন কাজ চলল। ঢুলীরা ঢোল বাজিয়েছে, যে পর্যন্ত ঢোলের শব্দ শোনা গেছে সে স্থান পর্যন্ত দীঘির সীমানা নির্ধারণ করা হল।

হাজার হাজার মাটিয়াল দীর্ঘ দশ বছর ধরে এক টানা খনন কার্য চালাল, কিন্তু পানি উঠল না। চারদিকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, কিন্তু কমলার দীঘিতে এক ফোটা পানিও জমে না। কিংবা পাতাল ফুড়েও পানি উঠে না।

www.pathagar.com

অনেকদিন এভাবে কেটে গেল। জমিদার কালারায় চিন্তায় পড়ে গেলেন। কোথা থেকে পানি আনা যায়? তাছাড়া প্রজা সাধারণের কাছেও তার সম্মান কমে যেতে থাকলো। এক সময় রাজা স্বপ্নে দেখলেন, যদি তার প্রাণপ্রিয় কন্যা, জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকে পুকুরে নামানো হয় তবেই কেবল পানি আসবে। রাজা একদিন তার কন্যাকে তার স্বপ্নের কথা বললেন। বাবার কথা শুনে কন্যা বলল — আমি প্রজাদের জন্য সবকিছু করতে পারি। জমিদার কন্যা সুন্দরী কমলা উত্তর শাহবাজপুর থেকে বজরা জোগে এখানে এলেন। দীঘির মধ্যস্থানে নীত হলেন। আর এমনি চারদিক থেকে খলখলিয়ে পানি উঠে সুন্দরী কমলাকে ডুবিয়ে দিল। রাজা কাঁদলেন, প্রজারা কাঁদলো কিন্তু কমলাকে আর ফিরে পাওয়া গেল না।

ঐতিহাসিক কমলার দীঘি আজ পরিত্যক্ত। শেওলা জন্মে এর ঐতিহ্য নষ্ট করে দিয়েছে। আগের মত দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে এখান থেকে পানি নিবে তো দূরের কথা, এখন অপ্রয়োজনে কেউ এদিক দিয়ে হাঁটেও না। রাশেদ এসেছে নাগরপুর এলাকা ঘুরে দেখতে। শত বছর পূর্বের সেই গৌবরমণ্ডিত কামলার দীঘির চেহারা কেমন হয়েছে, সেটা এক নজর দেখার দরকার ছিল। তার কাছে সমগ্র নিম্নাঞ্চলের দু'টি জিনিস বিখ্যাত। প্রথমটি হচ্ছে লেংডিয়ার বিল দ্বিতীয়টি এই কমলার দীঘি। হয়ত কিছুকাল পরে এই ঐতিহ্য দু'টিও হারিয়ে যাবে। কারণ তেতুলিয়া যেভাবে ভাংছে .. এক সময় এই নিদর্শন দু'টিও নদীর স্রোতের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তার আগে এই জনমের তরে দু'টো জিনিস দেখে মনের সাধ মিটাতে হয়।

বিশাল বিস্তৃত কমলার দীঘি। এপার থেকে ওপার অনেক দূর। এর পরিধি এক মাইলের কম হবে না। চারপাশে যে বকচট তাও হবে পুকুরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আগে উঁচু পাড় ছিল, পাড়ের উপর ছিল তালগাছ। দক্ষিণ প্রান্তে ছিল বিশালকায় একটি শিমুল গাছ। বহু দূর– দূরান্ত থেকে শিমুল গাছ দেখে নাগরপুরের নিশানা নির্ধারণ করা যেতো, এখন শিমুল গাছটা নেই। আগে যে পরিমাণ তালগাছ ছিল এখন সে পরিমাণও নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা গাছ ক্ষীণ অবয়ব নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেরাগে যখন তেল থাকে না তখন সলিতা পুড়ে যে রকম গোটা তৈরি হয়, এই নিরস দীঘির পাড়ে মৃতপ্রায় তাল গাছগুলিকে দেখলেও বিলীয়মান কমলার দীঘির অবলুপ্তির কথাই বার বার মনে পড়ে। রাশেদ এবড়ো থেবড়ো কমলার দীঘির পশ্চিম পাড় ধরে হাটতে হাটতে উত্তর দিকে যেতে লাগলো। দীঘির একেবারে পশ্চিম উত্তর কোণের পাড় কতকটা স্থান বেশ ঢালু। মনে হয় এখান দিয়ে বাইরে থেকে পানি ঢুকে আর পানি বৃদ্ধি পেলে এখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কাছাকাছি বয়স্ক মত একজন লোককে দেখেই রাশেদ থমকে দাঁড়ালো। এই অবেলায় নির্জন পরিত্যক্ত দীঘির পাড়ে আবার কোন ভূত–প্রেতের আগমণ নয় তো! এক সময় যে দীঘির স্বচ্ছ পানি থেকে সারা নাপরপুরবাসীকে মহামারী থেকে জীবন বাঁচিয়েছে। যে দীঘির পাড়ে নিয়ত পানির জন্য আসতো কত কুলবধূ, কত রং–বেরঙের মানুষ, সেই পুকুর পাড়ে হাঁটতে গিয়ে সে ভয়ে চমকে উঠল। মনে হল জনমানবহীন নিস্তব্ধ এস্থানে অভিশপ্ত প্রেতাত্মা তার ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। রাশেদ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করল — ভাই, এই স্থানটুকু এ রকম ঢালু কেন? লোকটি রাশেদের প্রশ্নের উত্তরে যা বলল সংক্ষেপে সেটা এই ঃ

কমলার দীঘিতে এক সময় যক্ষ্মা ছিল। যক্ষ্মারা অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাদ্য বাজাতো, গান গাইতো। পূর্ণিমার ঝকঝকে জ্যোস্না রাতে যদি কেউ দীঘির পশ্চিম পাড়ে দাঁড়াতো সে যক্ষ্মাদের গান শুনতে পেতো। প্রাচীন কাল থেকেই এ অবস্থা চলে আসছিল। এমন কি অভাবী কোন লোক এসে যদি তাদের কাছে কিছু চাইতো, সে তখন যক্ষ্মের ধন লাভ করতো। পরবর্তীকালে মানুষ কৌতুহলী হয়ে তাদের স্বাভাবিক কাজে বাঁধা দিতে শুরু করল। অনেককাল পরে এক নিশীথে এ স্থান দিয়ে তারা দীঘি ত্যাগ করে। ওদের চলে যাবার পর স্থানটি ভরাট করা সম্ভব হয়নি। একদিন মাটি ফেলা হলে পরদিন এসে দেখা যায় স্থানটি আবার নিচু হয়ে আছে। তারপর স্থানটি আর কেউ ভরাট করার উদ্যোগ নেয়নি। রাশেদ লোকটির সাথে অনেক্ষণ সময় কাটিয়ে পরে হাশেমদের বাড়ি চলে এলো।

হাশেমের বউ চমৎকার ঘরনী। রাশেদ ভাবেনি তার জন্য এত আয়োজন করা হবে। পোলাউ পাকানো হয়েছে, মুরগীর গোশত ভূনা করা হয়েছে। এছাড়া আছে ইলিশ মাছ ও পুদিনা পাতা দিয়ে ইলিশের ডিমের চচ্ছরি ও কোরাল মাছ ভাজি। শেষে আছে ডাল ও দৈ-চিনি।

অসাধারণ রান্না হয়েছে। পোলাউ এর সাথে ঠিক পরিমাণমত ঘী দেয়া হয়েছে। তরকারীর সাথেও মসলা দেয়া হয়েছে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। যেমন সুরেলা পল্লীগীতি, তেমনি করুণ বাঁশির সুর। বোঝাই যাচ্ছে রান্নার উপর তার পি এইচ ডি করা আছে।

হাশেম ও রাশেদ খেতে বসেছে। তাদের দু'জনের জন্য বন্টনকারী দুইজন, হাশেমের মা ও তার বউ। যেন দু'জনকে সমস্ত পোলাউ গিলানোর মধ্যেই আছে তাদের সফলতা ও আনন্দ।

হাশেমের মা রাশেদের পাতে ডিম তুলে দিচ্ছেন, মাছ তুলে দিচ্ছেন, গোশত তুলে দিচ্ছেন। রাশেদ বলল — খালাম্মা, আপনারা আমার জন্য এত কিছু করেছেন আমি ভাবিনি। জামাইকেও তো কোন শাশুড়ী এত আদর করে না।

: তুমি তো বাবা জামাই নও। তার চেয়েও বড় কিছু। তোমার হারিয়ে যাবার কথা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। নামাজ পড়ে অনেক দিন দোয়া করেছি।

: আপনাদের দোয়ার জোরেই বোধ হয় বেঁচে ছিলাম, নতুবা আমাদের পরিবাদের লোকরা যেভাবে মারা গেছে, তাদের সাথেই আমার সহমরণ হবার কথা ছিল।

: ছোট বেলায় তুমি আমাদের বাড়ি এসেছো, তোমাকে দেখে কি যে ভাল লাগতো! ভাবতাম — হাশেমের মত তুমিও যদি আমার ছেলে হতে!

: তাহলে তো ভালই হতো। আমি অন্তত মা-কে জীবিত পেতাম। তার স্নেহ লাভে ধন্য হতাম।

হাশেম বলল — তুই আমাদের বাড়িতেই থেকে যা, আমার মত ইলিশ জালে কাজ করতে হবে না। যখন যা ইচ্ছা তা-ই করবি।

www.pathagar.com

: বাড়িতে যখন এসেছি আরো ক'দিন থাকি। যদি ভাল না লাগে তোদের এখানে চলে আসব। আর ভাবী যেভাবে রান্না করেন, খাবারের লোভে হলেও আমার এখানে আরেকবার আসা উচিত।

হাশেমের বউ বলল — আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার স্বামী সব সময় তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়েই গল্প করেন। মনে হয় পৃথিবীতে সেই বন্ধুই সবচেয়ে বড় ব্যক্তি। তার জন্য আরো কিছু করতে পারলে খুব ভাল লাগতো।

: ভাবী আপনাদের মত ঘরনী যারা পায় তারা খুব ভাগ্যবান। হাশেম খুব বেশি পড়াশোনা না করেও যা পেয়েছে, আমি অনেক পড়েও তা পাইনি। হাশেম এই ভাঁটি অঞ্চলের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

জমিদার কালারায়ের কাচারীর খুব কাছাকাছি হাশেমদের বাড়ি। তার বাবা-দাদা বংশানুক্রমে জমিদারদের রায়ত ছিল। আর জমিদারদের রায়ত্বে থেকেই ইলিশ জালে কাজ করতো। কর্তাদের মাছ সাপ্লাই দিত। এজন্য কর্তাদের কাচারীর খুব কাছাকাছি ছিল তাদের বসবাস।

হাশেমের কোন ভাই নেই। বোন আছে দুইজন, দুইবোনের বিয়ের পর হাশেম বিয়ে করেছে। বাপ-দাদা জমিদারের কাছের মানুষ ছিল বটে কিন্তু জমিজমা খুব একটা করে যেতে পারেনি। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবার পর যে যেভাবে পেরেছে পরিত্যক্ত জমি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু হাশেমের বাবা কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেটা করনেনি। যদি তিনি কিছু রেখে যেতেন হাশেমকে আজ এত ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হতো না।

অবশেষে রাশেদ জানতে পারলো — হাশেম যে নৌকা দিয়ে মাছ মারে সেটা তার চাচাতো ভাই আলমগীরের কাছ থেকে দাদনে নেয়া। জাল তার নিজের হলেও নৌকার ভাড়া বাবদ তাকে মাসে মাসে অনেক টাকা পরিশোধ করতে হয়। গত বছর থেকে তার জালে আশানুরূপ মাছ পড়েনি। মাছ মারার জন্য সাগরের দিকে যাওয়া দরকার। সাগরে যেতে হলে ইঞ্জিনওয়ালা নৌকার প্রয়োজন। আরো বিশ গন্ডা জালের দরকার। এজন্য বড় ধরনের চালান দরকার, যা হাশেমের কাছে নেই। রাশেদ ইচ্ছে করলে হাশেমের বড় ধরনের দু'টি উপকার করতে পারে। সে আলমগীরের কাছ থেকে হাশেমকে একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিয়ে দিতে পারে।

দুই, দাদনের যে টাকা বাঁকি পড়েছে সেটার জন্য আরো সময় চাই, শর্ত হচ্ছে সুদ যেন না বাড়ে।

উত্তরে সে যা বলল তা এই : সে দেশে এসেছে এখনো এক সপ্তাহ হয়নি। এর মধ্যে আলমগীর সম্পর্কে লোকজনের কাছ থেকে সে খুব একটা ভাল ধারণা লাভ করেনি। যদিও আলমগীর এখন পর্যন্ত তার সাথে অতি মধুর ব্যবহার করে চলেছে, তবু এটা কতদিন চলবে তার নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। রাশেদ কেবল আলমগীরকে হাশেমের সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে পারে। এখন আলমগীর যদি তার ব্যবসায়িক স্বার্থে রাশেদের কথা না রাখে, তার জন্য কিছুই করার থাকবে না। হাশেম বলল — আমার হয়ে আলমগীরের কাছে সুপারিশ করার জন্য

www.pathagar.com

তোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তুই আমার বন্ধু, বাল্য বয়সের বন্ধু। তুই যদি আলমগীরের কাছে আমার হয়ে কিছু নাও বলিস, তবু তোর-আমার সম্পর্ক আগের মতই থাকবে। বরং তুই যদি স্থায়ীভাবে দেশে থেকে যেতে চাস এবং আমাকে তোর কোন কাজে লাগে, আমি তোর পাশে থাকব।

বিকেল পর্যন্ত রাশেদ হাশেমদের বাড়িতে ছিল। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলল। হাশেমের মা ও বউ তাকে বেশ কতটুকু এগিয়ে দিয়ে গেল। হাশেম তার সাথে ভেড়িবাঁধ পর্যন্ত এলো। দু'জন পাশাপাশি হাটছে। কেউ কোন কথা বলছে না। দু'জনের বুকেই অনেক কথা জমা। কেবল পাথর সরালেই যেন ভিতরের সমস্ত গুমোট এক নিশ্বাসে বেড়িয়ে আসে। অবশেষে মুখ খুলল রাশেদ —

: আচ্ছা হাশেম, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমার দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, আমাকে একটা সঠিক পরামর্শ দে তো !

: তোকে সঠিক পরামর্শ দেয়ার মত জ্ঞান আমার নেই। তবে তোর কথা শুনে আমি কেবল আমার মতামত জানাতে পারি মাত্র।

: তাতেই চলবে।

: তাহলে কথাটা বলতে পারিস।

: তোকে কেন বলতে চাই জানিস ?

: না বললে কিভাবে জানব।

: এই জগত সংসার সম্পর্কে তোর একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমার নেই। এছাড়া তুই আমার বন্ধু। তোর কাছেই কেবল বিশ্বাস করে সব কথা বলা যায়। তাতে আশা করি একটা উত্তর পাব এবং নিজের সম্মানও রক্ষা হবে।

: ঠিক একই কারণেই আমিও তোকে বাড়িতে ডেকে এনেছি। আমিও চাইনা আমার দুর্বলতাটা অন্য কেউ জেনে ফেলুক। নৌকার মাঝি হয়েছি তাতে কি হয়েছে, চুরি তো করছি না।

: আগে দেখতাম গ্রামের লোকরা কৃষি কাজ করতো। সকালে উঠেই কৃষক লাঙল নিয়ে মাঠে যেতো। শিউলী রসের হাড়ির নামানের জন্য গাছে উঠছো, ছেলেমেয়েরা মক্তবে যেতো। অথচ এখন সকলের সম্পর্ক নদীর সাথে। কারো নিজের নৌকা, কারো কেরায়া নৌকা। কেউ বা মাসিক কামলা হিসেবে খাটুনি খাটে।

: ভাঙ্গনের কারণে এখন জমির তুলনায় মানুষ বেশি। কৃষি কাজ করে পোষায় না। যার জন্য লোকজন নদীতে যায়। ঘন অমবস্যার উত্তাল রাতেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকজন মাছ ধরে। পদ্মা নদীতে আগে ছিল একজন কুবের মাঝি, এখন লক্ষ লক্ষ কুবের। নায়ে না গেলে তাদের জীবন অচল। তোর কথাটা বলে ফেল।

: গ্রামে আমি স্থায়ীভাবে থাকার কথা ভাবছি। তুই বলতো সিদ্ধান্তটা ঠিক হচ্ছে কিনা ?

: কেমন আর হবে। গ্রামের ছেলে গ্রামে থাকবি, তাতে দোষের কি ! তবে শর্ত হচ্ছে, আছে জমিটুকু ভেঙ্গে না গেলেই হয়।

www.pathagar.com

: ভাঙ্গার সম্ভাবনা কম। নদীর কূল ঘেঁষে চর জেগেছে। নাজিরপুরের পীর সাহেবের দোয়ার বরকতেই হোক অথবা এলাকাবাসীর প্রতি খোদার করুণার কারণেই হোক নদী আর আগের মত ভাংছে না। এখন মোটামুটি স্থায়ীভাবে একটা কিছু করা যায়। কি বলিস?

: ঘর সংসার শুরু করবি নাকি?

: আর কতদিন ছন্নছাড়া থাকতে বলিস?

: সংসার করতে চাইলে তো বিয়ে শাদি করতেই হবে। আর দেশে থাকলে চরফ্যাশন কলেজ থেকে ডিগ্রী পরীক্ষাটাও দিয়ে ফেলবো ভাবছি।

: পাত্রী পছন্দ করা আছে নাকি?

: সেই কাজটা তোদের উপরই ছেড়ে দিতে চাই।

: সেটাই দিতে হবে, কারণ.....।

: কারণ কিরে..... ?

: কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা পরে বলব।

: বাড়ি আসার পর থেকেই দেখছি সকলে আমার কাছ থেকে কি যেন একটা লুকানের চেষ্টা করছে। তুইও দেখছি তা-ই করছিস।

: আমি লুকাবো না। অবশ্যই বলব, তবে এখন নয়। একটু পরে।

বেলা পড়ে গেছে। সন্ধ্যার খুব বেশি বাকি নেই। সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। পশ্চিমাকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ জমতে শুরু করেছে। সেই মেঘ ভেদ করে সূর্যের রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়ছে নদীর সমগ্র উপকূল জুড়ে। দু'বন্ধু পশ্চিম দিকে মুখ করে ভেড়িবাঁধের উপর বসলো। এই এলাকাটা ফাঁকা। ভেড়িবাঁধের এক পাশে ধানী জমি আরেক পাশে নদী। বাঁধের একদিকে বনায়ন কর্মসূচির অধীনে চারাগাছ রোপন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেটা নেই।

বাঁধ সংলগ্ন নদী। ঢেউ এসে ছলাত ছলাত করে বাড়ি খাচ্ছে বাঁধের উপত্যকায়। এখানে খানিকটা বাঁক। বাঁকের সাথে মিলিয়ে বাঁধ দেয়া হয়েছে। তবু দেখলে মনে হয় নদী প্রবলবেগে ভাঙ্গতে থাকলে বাঁধের এই স্থানটুকু সকলের আগে ভেঙ্গে যাবে। চারদিক ফাঁকা। অনেক দূর পর্যন্ত কোন গাছ পালা নেই। রাশেদ বলল —

: আজ এখানে বসেই সূর্যস্ত দেখব।

: নিয়তই আমি সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখি। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই।

: আছে, থাকবেনা কেন? না থাকলে এত টাকা খরচ করে লোকজন সমুদ্র সৈকতে যায় কেন?

: সমুদ্র সীমাহীন। এরকম অসীম কিছু দেখে মানুষ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। তা-ও জীবনে একবার দুইবার। কিন্তু যারা সমুদ্রে বসবাস করে তারা সমুদ্রে ইলিশ মাছ ব্যতীত নতুন কিছুই খুঁজে পায় না।

: আমি একবার চট্টগ্রাম সী-বিচ দেখতে গিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সেই সী-বিচের চেয়ে আমাদের এই গাঙের কূল অনেক সুন্দর। কুয়াকাটার চেয়ে আমাদের ঐ পাতার চর

www.pathagar.com

আরো সুন্দর, অধিক মনোহর। ওখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় এবং সুর্যাস্ত আরো ভালভাবে উপভোগ করা যায়।

: রাশেদ।

: হ্যাঁ।

: তুই কী যেন বলতে চাচ্ছিস, কথাটা বলে ফেল।

: বলবো?

: হ্যাঁ বল,

: ভেড়িবাঁধের বিপরীত দিকে আমাদের আধা কানি জমি আছে। জমিটা এখন আলমগীরের দখলে। শুধু সেটা নয়, লেংডিয়ার বিলসহ বিভিন্ন স্থানে আমাদের যে জমিজমা সবগুলো আলমগীর দেখাশোনা করছে। আমার ইচ্ছে ঐ আধাকানী জমির মধ্যে বাড়ি নির্মাণ করি আর পুরান বাড়ির সবাইকে সেখানে নিয়ে যাই। নদী বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ঘরের ভিটায় আঘাত হানতে পারে। তার আগে ঘরগুলো সরিয়ে নেয়া উচিত। তোর কি বক্তব্য?

: সকলের কথা এ মুহূর্তে ভাবার দরকার নেই। তুই ছাড়া প্রত্যেকেই তাদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, তুই যে ওখানে ঘর তুলতে চাস আলমগীর কি সেটা জানে?

: এখানো তাকে বলা হয়নি।

: ঘর তুলতে তো অনেক টাকার দরকার, সেটা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

: আলমগীরের কাছ থেকে লোন নিতে চাই।

: অন্যের উপর ভরসা করে এত বড় পরিকল্পনা নেয়া কি ঠিক হবে?

: আমার ধারণা, আলমগীর আমার কথা রাখবে। আর রাখার যৌক্তিক কারণ আছে। আমার জমির অনেকদিনের আয়-ব্যয় তার কাছে।

: কথা রাখলে তো ভালই। তবে আলমগীরের উপর আমার বিশ্বাস হয় না। বেটা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। তোকে যদি সাহায্য করতে রাজিও হয় তবু উদ্দেশ্য থাকবে তোকে স্থায়ীভাবে ছোট করে রাখা। ফলে কখনো অন্যায় করে বসলেও তার প্রতিবাদ করা যাবে না।

: আমি তো সাহায্য চাচ্ছি না। জমির আয়ের অংশ চাচ্ছি।

: জমিগুলি যে তোর, তার দলীলপত্র কি তোর কাছে আছে?

: তা তো নেই।

: দলিল ছাড়া জমির মালিকানা প্রমাণিত হয় না।

: সদরে নিশ্চয়ই তার রেকর্ড-পত্র আছে। দরকার হয় কিছু জমি বিক্রি করে দিব।

: জমি খুব সস্তা। নদী ভাংছে বিধায় এখানকার জমি কেউ কিনতে চায় না, আর আলমগীরের রেড সিগনাল পেলে কেউই এতে হাত দেয়ার সাহস পাবে না।

: তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে — আমি আলমগীর কর্তৃক আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কিছুই করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

: করা যাবে না বলছিনা.....।

: হাশেম !

: বল।

: তিন পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের সদস্যরা গ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। আজ আলমগীরের কথায় সকলে উঠে বসে, সেও আমাদের বংশের লোক। এটা দেখে আমার খারাপ লাগছে না। তবু তোরা কেন তার ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখাচ্ছিস — আমার বুঝে আসে না।

: সেটা সময় হলেই টের পাবি। সমাজের নেতা হওয়া আর মাস্তান হওয়া এক কথা না।

: হাশেম, তুই একটি বিশেষ কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলি, কথাটি বল।

: আজ থাক। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, মনে হয় ঝড় আসবে। কাল একবার চরকলমী বাজারে যাব, তখন বলব।

দেখতে দেখতে ঝড় শুরু হয়ে গেল, ঝড়ের সাথে প্রবল বৃষ্টি। চারদিকে কোথাও বাড়ি ঘর, গাছপালা নেই। হাশেম বৃষ্টির শুরুতেই বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে। রাশেদকে যেতে হচ্ছে দক্ষিণ দিকে, বৃষ্টি–বাতাস উপেক্ষা করে। যে রাতে সে চরকলমী আসে সে রাতেও ছিল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই। আজও আবার শুরু হল বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ। সমুদ্র পাড়ের মানুষদের ব্যাপারে ইবনে খালদুন তার আলমোকাদ্দমায় বলেছেন — তারা নাকি খুব মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়। অথচ তার মনে হয় — সমুদ্র পাড়ের মানুষরা খেয়ালী প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল। ঝড়,বন্যা, ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, যখন ইচ্ছা তাদের জীবন নিয়ে হলিখেলা খেলে। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি কারই নেই। সেই রাতেও রাশেদ ঝড়ের দাপট অতিক্রম করে এগুবার চেষ্টা করে ছিল, আজও সে এগুবার চেষ্টা করছে। তার ভয় লাগছে। জনমানবহীন এই ভেড়িবাঁধের উপর নদী থেকে উত্থিত কোন জলপরী এসে যদি ধাক্কা দিয়ে নদীর দিকে ফেলে দেয় ! রাশেদের জীবনটা একটা সংগ্রামমুখর জীবন। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে প্রলংকরী ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে জিহাদ করেই এগুতে হচ্ছে। এখনো সে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভয়াল রাতের দুই'শ মাইল বেগে প্রবাহিত তুফানকে প্রতিহত করে যে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

ছয়.

রাশেদ চরকলমীর বাজার থেকে একখানা খাতা কিনল। ডায়েরী জাতীয় কিছু এই বাজারে না থাকায় মোটা দেখে একটি খাতাই কিনতে হল। তার কিছু কথা লিখে রাখা দরকার। ছোট বেলা থেকে তার ডায়েরী রাখার অভ্যাস ছিল। সব সময় সব দিনের ঘটনা নয়। বিশেষ কোন ঘটনা, বিশেষ কোন সময়ের কথা — যা মনের উপর প্রভাব ফেলেছে, সে সব কথাই সে লিখে রাখতো। এসব ডায়েরী খুব যত্নের সাথে সংরক্ষিত হয়নি। কিছু লেখা সংরক্ষিত ছিল

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির লকারে, সে তিন বছর জেল খেটে এসে দেখলো লকার খালী। তার নিজের বলতে কিছুই আর বাকি নেই। নষ্ট হয়েছে নিজের লেখা ডায়েরী, বিভিন্ন সময়ে মনের আবেগে লেখা কিছু কবিতা। যেহেতু আগে কোন লেখা তার হেফাজতে নেই, সুতরাং সে আজ অনেক কথাই লিখবে। জীবনের প্রারম্ভ থেকে এপর্যন্ত যা মনে আসে সবই এ খাতায় লিখে রাখবে। সে ছোট বেলায় এনা ফ্রাংকের ডায়েরী পড়েছিল। একজন ছোট ইহুদী মেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক'দিনের বিভীষিকাময় স্মৃতি লিখে রেখেছিল। সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক'দিনে রোজনামচাই এক সময় বিখ্যাত হয়ে যায়। এনাফ্রাংক নেই কিন্তু সে একজন ক্ষুদ্র বালিকা হয়ে এখনো সকলের মাঝে বেঁচে আছে।

রাশেদের জীবনটাও কম ঘটনাবহুল নয়। তার জন্মের সময় মায়ের মৃত্যু হয়। দাদার মৃত্যু হয় তার চতুর্থ শ্রেণীতে থাকা অবস্থায়। এক প্রলংকারী জলোচ্ছ্বাস বাবাসহ বাড়ির বেশ ক'জন লোককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অলৌকিকভাবে দাদী বেঁচে গেলেও তার দশম শ্রেণীর ফল প্রকাশের সময় তারও মৃত্যু হয়। মনে হয় তার জীবনটাই একটা ট্রাজেডি। তার মত একটি অভিশাপ্ত শিশুর জন্ম না হলে এতগুলো লোকের অকাল মৃত্যু হতো না। মনে হয় ইডিপাসের জীবনের সাথে তার জীবনের মিল আছে। এক সময় ইডিপাস তার বাবাকে খুন করেছিলেন। অথচ ইডিপাসের জন্ম না হলে এত কালের প্রভাবশালী একটি বিশাল রাজপরিবার ধ্বংস হতো না এবং এতগুলো লোককেও আত্মহুঁতি দিতে হতো না। ইডিপাসের সাথে তার আরেকটি মিল আছে। ইডিপাস লালিত পালিত হন ভিন দেশীয় এক নিঃসন্তান রাজার খাস মহলে আর সে বেড়ে উঠে সদরের একটি বোর্ডিং স্কুলে।

রাশেদ লিখতে শুরু করল :

আমি সর্বহারা এক হতভাগ্য যুবক। সামান্য যৌবন ছাড়া আমার হাতে আর কিছুই বাঁকি নেই। পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি যা এখনো নদীর ভাঙ্গন থেকে বেঁচে আছে সেটাও এখন অন্যের দখলে। পুরনো ঐতিহ্য বলতে যা বোঝায় সেটা নদী প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। রবিনসনক্রুসু যেভাবে জনমানবহীন নতুন দ্বীপে গিয়ে এককভাবে জীবন শুরু করেছিলেন আমিও তেমনি ধ্বংসপ্রায় ভিতের উপর আবার নতুন করে ইটের গাঁথুনি দিতে চাই। কিন্তু যে উৎস থেকে অর্থ আসবে সে উৎসের ব্যাপারে সকলের সন্দেহ। নিজেও ক'টি ঘটনার প্রেক্ষিতে তার উপর ভরসা করতে পারছিনা। আমি এখনো আলমগীরকে নিজের কথা বলিনি। কেবল হাশেমের সমস্যার কথাটা বলেছিলাম। আলমগীর মনোযোগ সহকারে শুনেছে বটে, কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলেনি। যদিও জানি ব্যবসায়ীরা সরাসরি কাউকে টাকা ধার দেয় না, তবু আমি তার কাছে লাখ খানেক টাকা ধার চাব। একখণ্ড নিচু জমির উপর ভিটি উঁচু করে গাছপালা কিনে ঘর তৈরি করতে লাখ খানেক টাকা লেগে যেতে পারে।

চরকলমী মানে একেবারে ভাসান চর নয়। যদিও এখানে নদী ঘরের কাছে বিধায় জোয়ারের পানি বাড়িতে আসে। আগের অবস্থা কিন্তু এরকম ছিল না। আগে শুধু বর্ষার দিনে হঠাৎ যখন পানির চাপ বৃদ্ধি পেতো কেবল তখনই জোয়ারের পানি বাগানে উঠতো। জলোচ্ছ্বাস ছাড়া কখনোই বাড়িতে পানি দেখা যায় নি। চরকলমী ছোট একটি গ্রাম, যার একদিকে বইছে প্রমত্ত তেতুলিয়া, অন্যদিকে কচুখালির প্রশস্ত খাল। যে খালটি ফরিদপুরের কুমার নদীর চেয়েও প্রশস্ত। তবু এখানে এটি খাল ছাড়া কিছু নয়। এ গ্রামের দু'টি অংশ

www.pathagar.com

হলেও লোকসংখ্যা খুব বেশি নয়। ছেলেবুড়ো মিলিয়ে হাজার দুই বা তার চেয়ে সামান্য কম বেশি। এক সময় এই অসহায় নিরক্ষর লোকগুলোর একজন লিডার ছিল। আজ তারা নেতাশূন্য। আলমগীর যদিও নিজেকে সকলের অভিভাবক মনে করে, বাস্তবে লোকজন তাকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে। কিছু লোক তাকে ঘৃণা করলেও প্রকাশ্যে কটুক্তি করার সাহস পায় না। আমার এখানে ফিরে আসার পর কিছু লোকের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই আগ্রহের অর্থ এই নয় যে, তারা রাতারাতি আমাকে তাদের ত্রাণকর্তা বানিয়ে ফেলবে। চরকলমী মানে বিচ্ছিন্ন শ'দুয়েক বাড়ি। এক বাড়ি থেকে অন্যবাড়ি যাবার জন্য আগেও প্রশস্ত কোন রাস্তাঘাট ছিল না, এখনো নেই। কেবল লেংডিয়ার বিলের মধ্যদিয়ে যখন মোজাম্মেলের রাস্তা হল তখন দাদা কচুখালী থেকে গ্রামের দক্ষিণ মাথা পর্যন্ত নিজের উদ্যোগে একটি রাস্তা তৈরি করে দেন। এই রাস্তা হওয়ার পর নৌকার ব্যবহার কিছুটা কমে যায়। কিন্তু গ্রামের পূর্ব প্রান্তের লোকগুলিকে আজ অব্দি নৌকা দিয়েই চরকলমী বাজারে যাতায়াত করতে হয়।

এই গ্রামের লোকদের কালচার সম্পর্কে খুব বেশি জানি না। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্তই আমি এখানে থেকেছি এবং পড়াশোনা করেছি। তারপর বোর্ডিং স্কুলে চলে যাবার পর কদাচিত এখানে আসা হতো। বিশেষ করে দাদীর মৃত্যুর পর আমার গ্রামে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। একারণে গ্রামের লোক কেউ আমাকে চিনে, কেউ চিনে না।

আমি যে বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে সদরে চলে যাই সে বছর ইয়ানূর তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। পশ্চিম কান্দি থেকে তাকে প্রতিদিন ডিঙিতে চড়ে স্কুলে আসতে হতো। ছোট বেলায় মাঝেমধ্যে দাদীর সাথে রফিক চাচাদের বাড়ি যেতাম এবং ভাবতাম একদিন হয়ত ইয়ানূর আমার বউ হবে।

রফিক চাচা দাদীর দিকের আত্মীয়। তার এক সময় অবস্থা ভাল ছিল বিধায় তিনি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতই ছিলেন। যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন ততদিন তাদের দু'জনকে এক সাথেই দেখা যেতো। রফিক চাচা ভাল গান গাইতে জানতেন। এক সময় নাকি তিনি কোন এক যাত্রা দলের সাথে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। পরবর্তীতে সামাজিক কারণে তাকে সে দল ছেড়ে দিতে হয়। দাদার বেঁচে থাকা অবস্থায় চরকাশেমের সাইদ বয়াতীর সাথে রফিক চাচার কবি গানের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার পর তিনি স্থায়ীভাবে গান গাওয়া বন্ধ করে দেন। পরে বাবার সাথে সদরে গিয়ে কি যেন একটা ব্যবসার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের প্রলংকরী জলোচ্ছাসে বাবা যখন হারিয়ে গেলেন, তখন থেকে রফিক চাচা যেন সকল কাজের উপরেই আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। আমাদের বাড়িতেও তার যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

ছোট বেলায় আমি যতনা ইয়ানূরদের বাড়ি গেছি, তার চেয়ে বেশি ইয়ানূর এসেছে আমাদের বাড়িতে। ইয়ানূরের মা মাসে অন্তত একবার দাদীকে দেখতে আসতেন। আসার সময় নিয়ে আসতেন ইয়ানূরকে। তখনো তার ছোট দুইভায়ের জন্ম হয়নি। ইয়ানূর এলেই যেন আমাদের শূন্যঘর প্রাণ ফিরে পেতো। দাদীও মহাখুশী হতেন। তার নিজের মেয়ের ছেলে সাদেক এলেও তিনি এত খুশী হতেন না। ইয়ানূর এলে আমারও খুব আনন্দ হতো। আমাদের পুকুর পাড়ে একটা বাঁকা আতাফল গাছ ছিল। আমরা সেই গাছের গোড়া দিয়ে উঠে আগা

www.pathagar.com

দিয়ে নেমে যেতাম এবং একজন আরেকজনকে ধরার চেষ্টা করতাম। সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ দিনেও ইয়ানূর আমার সাথে কখনো পেরে উঠতো না। একবার দাদীর ভীষণ অসুখ, ইয়ানূরের মা আমাদের বাড়ি দশদিন থাকলেন। দাদী মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর ইয়ানূরের মা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন দাদী বললেন — ইয়ানূরের মা, তুমি ইয়ানূরকে রেখে যাও। একদিন তো তাকে এ বাড়িতে থাকতেই হবে। সেই থাকার অভ্যাসটা আগে থেকেই শুরু হোক। সত্যই সেবার ইয়ানূর দু'দিন থেকে গেল। সেই দু'দিনে এমন আচরণ করলো যেন সে আমার বউ। এইটুকু বালিকার এহেন বউ চরিত্রে অভিনয় দেখে দাদীও খুব খুশী হয়েছিলেন।

মেয়েরা বোধ হয় শিশু বয়সেই বুঝে ফেলে তাকে একদিন বউ হতে হবে। এবং একজন অচেনা অজানা মানুষের হাত ধরেই তাকে চিরচেনা বাপের বাড়ি পরিত্যাগ করতে হবে। সেই অচীন লোকটিই হবে তার জীবনমৃত্যুর সাথী। আর অভিনয় দেখিয়েই তার মন ভোলাতে হবে। এজন্য বউ চরিত্রে অভিনয়টা মেয়েরা অতি শৈশব থেকেই ভালভাবে শিখতে শুরু করে। ইয়ানূর সেই শিশু বয়সে যে বউ সেজেছিল, সেই সাজন কি আজ আমার জীবনে কোন কাজে লাগবে? যদিও ইয়ানূর এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সরাসরি কোন কথা বলছে না, তবু অস্পষ্ট ভাবে জেনেছি যে ইয়ানূরের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছোট দাদা ও বন্ধু হাশেম হয়ত এ কথাটাই বলতে চেয়েও বলেনি। তারা হয়ত ভাবছে, এ ভয়ানক কথাটা আমি সহজভাবে নিতে পারব না। আমার শোচনীয় অবস্থা হয়ত আরো করুণ হয়ে পড়বে। আমার মনে হয় তাদের অনুমান সঠিক নয়। কারণ হারাতে হারাতে আমার আর হারানোর মত কিছু নেই। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে ইয়ানূরের কোন দোষ নেই। তার যা বয়স এতদিনে অন্তত দু'সন্তানের মা হবার কথা। আমি তো এখানে পা রাখার আগে তাই মনে করেছিলাম। পনের বছরে পৌছার আগেই যেখানে সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সে যে এতদিন বিয়ে না করে থেকেছে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

চরকলমীতে ভাল শিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। সারা উজান অঞ্চলে একজন মাত্র বি. এ. পাস। চরমনোহরের গফুর আলীর ছেলে রতন গতবছর বি. এ. পাস করে প্রমাণ করলো সে এই নিম্নাঞ্চলের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। আই. এ. পাশ দুইজন, একজন আমাদের বাড়ির ফিরোজ দ্বিতীয় জন আমিনুল্লা কেরানীর কনিষ্ট ছেলে সেলিম। গ্রামের দুইজন সর্বজন মান্য লিডার — একজন আমার চাইতো ভাই আলমগীর, দ্বিতীয় জন কেরানী সাহেবের ছেলে বাবুল। এই দু'জনই ফাইভ পাশ, তাও চরকলমীতে স্কুল ছিল বলে তারা এতটা পড়তে পেরেছিল। মির্জাকালু স্কুলের মত এত নামকরা স্কুল উজান অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও তাদের সে পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক প্রার্থীর মধ্যে যখন ইয়ানূরকে পাত্র পছন্দ করতে বলা হল তখন সে বি.এ পাশ রতনের চেয়ে আই.এ পাশ ফিরোজকেই পছন্দ করল। এর অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, ফিরোজ সদরের একটি ডিসপেনসারীতে কম্পাউন্ডারের চাকরি করে। আর ইয়ানূরও সদরের মহিলা কলেজ হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করছে। প্রাচীন বাংলার লোকগাঁথায় এরকম কত কাহিনী প্রচলিত আছে যে, নায়ক বাণিজ্যে যায়। অনেক বছর ধরে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। বাংলার সতীনারী কোথাও যায় না। তার বন্ধুর পথ চেয়ে বসে থাকে। এক যুগ পর নায়ক যখন ফিরে আসে তখন সেই

www.pathagar.com

নায়িকার সাথেই তার মিলন হয়। সেই লোকগাঁথা আর বর্তমান কঠিন বাস্তবতা কত ব্যবধান ! ইয়ানূর তার অপেক্ষায় থাকবে, বার বছর পর ফিরে এসে তাকে সতীস্বাধী পাওয়া যাবে, এটা কেবল লোকগাঁথাতেই মানায়, বাস্তবে নয়।

আমার জীবন আরম্ভ হয়েছিল অতিশয় চমৎকার ভাবে। এস. এস. সির রেজাল্টই তার বড় প্রমাণ। তারপর দিন যতই এগিয়েছে আমি ততই পিছিয়ে গেছি। নানান জটিলতায় নিজেকে পেঁচিয়ে ফেলেছি। কথায় আছে — শেষ ভাল যার সব ভাল তার। আমার শেষটা খারাপ হয়েছে, সুতরাং আমাকে ভাল বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। উচ্চ মাধ্যমিকের সময় থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই রাজনীতিই আমার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো। সকল কাজের সফল্যের পিছনে- শক্তিশালী ধাক্কার প্রয়োজন হয়। আমি রাজনীতিতে যে জড়ালাম এমন এক সময় যখন একে একে আমার পায়ের নীচ থেকে সবগুলো খুঁটি ভেঙ্গে গেছে। অথচ রাজনীতি করার পূর্বশর্তই হচ্ছে বাপের জমিদারী থাকা। যেমন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জুলফিকার আলী ভুট্টো, জওহর লাল নেহেরু, সোহরাওয়ার্দী, সলিমুল্লা প্রত্যেকের জমিদারী ছিল।

ফুলের সাথে সৌন্দর্যের যে সম্পর্ক তেমনি রাজনীতির সাথে ক্ষমতার সেই সম্পর্ক। কেউ সারাজীবন রাজনীতি করলো কিন্তু ক্ষমতা পেলো না, তাহলে তার জীবনটাই ব্যর্থ। কাজ করলে তার ফলতো চাইই। রাজনীতির ফল হচ্ছে ক্ষমতা আর এই ক্ষমতার মাধ্যমেই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন হয়। আমি জীবনের দামী একটা সময়ে যখন নিজেকে গড়ে তুলব তখনই আমি অন্যের জন্য শ্লোগান দিয়েছি। অন্যের সাজানো কথা মুখে আওড়ে নিজেকে বড় একটা কিছু ভেবেছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কত কাজ করেছি। পার্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কত নোংরা কাজে হাত দিয়েছি, তার হিসেব কে রাখে ! একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শে যখন একজন আবেগ প্রাবণ যুবক দীক্ষিত হয় তখন তার সামনে পার্টির চেয়ে বড় কিছু থাকে না। অন্যেরা বিপরীত কিছু বললেও তাদের কথাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাজানো কাহিনী বলেই মনে হয়। শুরা পানের পর একজন মদ্যপের কাছে চারদিক যেমন ঘোরের মত মনে হয় তেমনি রাজনীতিরও আছে সর্বনাশী এক নেশা। যারা এতে একবার জড়িয়ে যায় তাদের আর সেখান থেকে পিছিয়ে আসা সম্ভব হয় না।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম যখন একটি রাজনৈতিক দলের ফরম পুরণ করি তখন ব্যাপারটা খুব গুরুত্বের সাথে নেইনি। ভাবলাম, আমার ফরম পুরণ দ্বারা যদি স্বীয় পছন্দের পার্টির কোন উপকার হয় তাতে দোষ কি ! আমি তো সর্বক্ষণ দল নিয়ে বসে থাকবো না। কখনো যদি একটু মিটিং মিছিল হয়, তাতে ক্ষণিকের জন্য অংশ গ্রহণ করব। যেহেতু আমি একজন ছাত্র, আমার আসল কাজ হবে পড়াশোনা। বই পড়ার বাইরে সময়টা অন্যদের সাথে কাটালে ক্ষতির তো কিছু নেই। একটি কথা নির্মম সত্য, আর তা হল — প্রবেশ করার সময় কোন রাজনৈতিক দলকে যতটা সহজ ও উন্নত মনে হয় কার্যত উহা মোটেই তত উন্নত নয়। একবার নোংরামিতে জড়ালে কোন বলিষ্ট লোকের পক্ষেও সেখানে থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না। ফিরতে হলে তাকে লাশ হয়েই ফিরতে হয়।

www.pathagar.com

কোন ক্লাব বা দলে যোগ দিলে প্রথমে তাকে নানা রকম কল্যাণের কথা বলা হয়। নানা বিষয়ে তালিম দেয়া হয়। এরমধ্যে পার্টির আদর্শ উদ্দেশ্যই প্রধান। মটিভেশনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তাকে পরীক্ষামূলক কিছু কাজ প্রদান করা হয়। সে কাজে সফলতা এলে অবস্থা বুঝে তার সামনে কিছু টোপ রাখা হয়। তারমধ্যে নিজের লাভ, পরিচিত হওয়া, ক্ষমতা অর্জন করা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনই অন্যতম। আমার ক'বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি — কোন দলের আদর্শে দীক্ষিত হলে যদি নিজের ভিত্তি মজবুত না থাকে তাহলে সে নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন আমি পরিবর্তিত হয়েছি। মাধ্যমিকে ষ্টাণ্ড করলেও উচ্চ মাধ্যমিকে এসে দ্বিতীয় বিভাগ নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পার্টি থেকে সান্ত্বনা স্বরূপ বলা হয়েছে — সামনে কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন, এতে তুমি ভিপি বা জিএস পদে নির্বাচন করতে পারলে তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে। পরে যখন নির্বাচন এলো তখন আমাকে ভিপি/জিএস তো দূরের কথা একজন সদস্য পদেও মনোয়ন দেয়া হল না। পার্টির সভাপতির সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বললেন — তোমার কথা আমার মনে থাকবে। পরিশ্রম করে যাও, আগামী বছর তোমার পালা। ভাগ্যিস এসব তোয়াক্কা না করে শেষ পর্যন্ত একজন মহৎপ্রাণ শিক্ষকের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। নতুবা এতটা পড়াশুনাও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

সবটুকু পানি যেমন কাজে লাগে না তেমনি সকল কথাও সত্য হয় না। ইয়ানূরকে বলেছিলাম — আমি একবন্ধুর বিয়ের সাক্ষী হওয়ার জন্য কুমিল্লা গিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে পক্ষের সম্মতি না থাকায় তারা রবপক্ষের বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দেয়। এবং মেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় ক'জনের তিন বছরের জেল হয়। তার মধ্যে আমি একজন। মূলত এর পুরো ঘটনাই বানোয়াট। তাৎক্ষনিক ভাবে উত্তর দেয়ায় জন্য আমি এ ঘটনাটি সাজিয়েছি। আসল ঘটনা কেউ জানে না। এ অঞ্চলের কারো সেটা জানার কথাও নয়। তবে সত্য কথাটা আজ আমি নিশ্চয়ই বলব।

রাজনীতিকদের যতটা সহজ মনে হয় তারা কিন্তু ততটা সহজ মানুষ না। একজন সরল মানুষও রাজনীতিতে ঢুকলে সে অতীব গরল হয়েই বেরিয়ে আসে। আমাকে এখন চরকলমীর লোকরা যতটা সহজ ভাবছে সত্যই কি আমি ততটা সহজ? আমাকে গ্রামের লোকরা একজন ভাল মানুষ হিসেবে নিলেও আলমগীর নেয়নি। কারণ আলমগীর একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। মানুষকে চিনতে তার খুব কষ্ট হওয়ায় কথা নয়। সে আমার বিগত রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আমার ধারণা, আমাকে দেয়ার জন্য সে বেশ কিছু টাকা জোগাড় করে রেখেছে। চাওয়ার পর দু'একদিন সময় নিয়ে টাকাটা দিবে। এরপর থেকেই শুরু হবে আমাকে কেন্দ্র করে তার রাজনীতি। তবে শেষ পর্যন্ত আমি পেরে উঠব কিনা সন্দেহ। কারণ সে এখানকার দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত শক্তি। আর আমি অনেকাংশে বহিরাগত। প্রত্যেক রাজনীতিকেরই একটা সাপোর্টার গ্রুপ থাকে। যারা অনেকটা অন্ধ ভাবে নেতার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে। এ রকম সাপোর্টার না থাকলে কারো পক্ষে ক্ষমতা লাভ এত সহজ নয়। হয়রত মুহাম্মদ (সঃ) এর-ও একটা সমর্থক শ্রেণী তৈরি হয়েছিল, যারা সর্বক্ষণ রাসূলকে ঘিরে থাকতো। রাসূলও তাদের চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। আমি যখন ঢাকা গিয়ে নেতাদের সাথে হাটতে শুরু করলাম তখন দেখলাম আমার চেয়েও অনেক

www.pathagar.com

মেধাবী ছাত্র এখানে রাজনীতি করছে। এখানে নেতা হওয়াতো দূরের কথা চামচা হতে চাইলেও তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়।

মফস্বলে ছিলাম ভাল ছিলাম। পার্টি থেকে কাজের বিনিময়ে কিছু পয়সা দেয়া হতো। ঢাকাতে সে রকম পয়সা দেয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা জানা গেল না। তবে ছেলেদের মাঝে মধ্যে দেখা যায় — পার্টির নাম করে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে জোরপূর্বক চাঁদা তোলে এবং স্বাচ্ছন্দে সেটা দিয়ে চলে। আমি প্রথমদিকে একটি টিউশনী জোগাড় করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে দিবে আমাকে টিউশনী? এখানে আমার আপনজন বলতে তো কেউই নেই। গ্রাম থেকে যে কেউ টাকা পাঠাবে তারও কোন সম্ভবনা নেই। অবস্থা সঙ্গীন দেখে একদিন পার্টির মাস্তান ধরনের ক'জনের সাথে ভিড়ে গেলাম। চারজনের একটি দল। একটি পিস্তল, একটি ছুরি — এই হল সম্বল। উদ্দেশ্য চাঁদা তোলা। আমরা এ্যালিফ্যান্ট রোডের একটি দোকানে গিয়ে চাঁদা চাইলাম। অল্পতেই কাজ হল। ম্যানেজারের বুকে পিস্তল ঠেকাতেই সে দশের পরিবর্তে পাঁচ হাজার দিতে রাজি হল। আমরা দোতলা থেকে চাঁদা নিয়ে নিচে নামছি, এমনি হৈ হৈ করে সংঘবদ্ধ দোকানদাররা আমাদের ঘিরে ফেললো। ওস্তাদ দু'জন পালাতে সক্ষম হলেও আমরা শিক্ষানবিশ দু'জন কর্তব্যরত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। পরদিন কোর্টে চালান হল। আমার সঙ্গীটি ছয় মাসের মাথায় ছাড়া পেলেও অস্ত্ররাখা ও ছিনতাই এর মামলায় আমার তিন বছর সাজা হল। যেহেতু আমার তদবীর করার কেউ ছিল না, সেহেতু পুরো তিন বছর জেল খেটেই বের হতে হল। হায়রে পুলিশ! ওরা যে মানুষ, ওদের হেফাজতে থাকলে সেটা বুঝার কোন কায়দা নেই।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হলে গেলাম। দেখলাম — আমার জিনিস পত্র কিছু নেই। রুমের একজন ছাড়া অন্যরা কেউ আমার পরিচিতও নয়। নিজের গায়ে দোষ থাকায় তাদেরকে চাপও দিতে পারলাম না। দেখলাম — আমার ডিকশোনারীটাও অন্যে ব্যবহার করছে। কিন্তু বলতে পারলাম না যে, ভাই এটি আমার ডিকশোনারী। যেন আমি এক প্রবাসী যুবক। অনেকদিন পর দেশে ফিরে দেখলাম আমার স্ত্রী অন্যের ঘরনী। আমার ছেলে অন্যকে বাপ ডাকছে। সব জেনেও মানুষ বোবা হয়ে বেঁচে থাকে। আমিও আজ বোবা। আমার বলার মত কিছুই নেই। কারো কাছে কোন অভিযোগও নেই।

সত্য কখনো গোপন থাকে না। তার শক্তিশালী হাত পা আছে। তার প্রাণও কৈ মাছের মত মহাপ্রাণ। মিথ্যার জয়ডঙ্কা যত জোরেই বাজুক না কেন সব ছাপিয়ে সত্য একদিন সশরীরে সকলের সম্মুখে মহীরূহ হয়ে উপস্থিত হবেই।

আমি যে চাঁদাবাজি করতে গেছি এটা সত্য। পরদিন দু'টি দৈনিক পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। আমি জানি, যদি কোন দিন বড় কোন কাজ করার উদ্যোগ নেই তাহলে প্রতিপক্ষ এই ঘটনাকে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। যেমন ইউরোপ আমেরিকার লোকদের চরিত্র যতই খারাপ হোক না কেন, তাতে কারো কিছু যায়- আসে না। কিন্তু যখনই কেউ সিনেট বা প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তখনই প্রতিপক্ষ সেটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আর প্রার্থীকে কুপোকাত করার জন্য একটি মেয়েলী ত্রুটিই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

আজ আমি লিখছি। ডায়েরীতে কখনো মিথ্যা লেখা যায় না। আমিও লিখতে পারব না। বরং স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করছি। নির্মম কোন শত্রু হয়ত আমার সম্পর্কে কিছুই জানবে না। কিন্তু এই জবানবন্দিই একদিন আমার বিরুদ্ধে 'কাল' হয়ে দাঁড়াবে। যে পড়বে সে জানবে, অন্যকে জানাবে। এভাবে এক কান থেকে আরেক কান। ধীরে ধীরে চরকলমীর সব লোকরা জেনে ফেলবে যে, তাদের আদর্শ ছেলেটি চাঁদাবাজীর অপরাধে তিন বছর জেল খেটেছিল। তবু আমি সত্য কথাটাই লিখে রাখব। মাওলানা আজাদের ত্রিশ পৃষ্ঠার এক বক্তব্য ত্রিশ বছর যাদুঘরে সিন্দুক বন্দী ছিল। দীর্ঘকাল পর যখন সিন্দুক খোলা হল তখন সত্য কথাটা জেনে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। সকলে বিশ্বাস করল যে, তার কথাটাই সত্য ছিল।

ইয়ানূরের ব্যাপারে লোকমুখে যা শুনছি সেটাকে যথার্থ বলেই মনে হয়। বাল্য বয়সে তার পক্ষে আমার বউ সাজা যত সহজ ছিল এখন তত সহজ নয়। সে এখন বাগদত্তা। যথারীতি আংটি বদল হয়ে গেছে। যদিও ফিরোজ এবং ইয়ানূর দু'জনই নদীভাঙ্গা পরিবারের ছেলে মেয়ে তবু তারাই তো গ্রামের শ্রেষ্ঠ সন্তান। সুতরাং তাদের বিয়েটা একটু গর্জিয়াস হবে এটাই স্বাভাবিক। আমি তাদের বিয়েটা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সঠিক সহযোগিতা করব।

আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমি নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিব। এব্যাপারে ইয়ানূর বা রফিক চাচা কারো মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ঘর উঠানোর কাজ সমাপ্ত হলেই আমি রফিক চাচাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব এবং ইয়ানূরকে নতুন বাড়ি থেকেই তুলে দিব। আগে থেকে কাউকে কিছু বলব না। সকলে ভাববে আমি বুঝি ইয়ানূরকে বউ করে আনার জন্যই ঘর তুলছি।

ঝরঝর করে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির সাথে এক টানা বাতাসও আছে। বাতাসের চাপে নড়বড়ে টিনের ঘরটি কাঁতরানোর মত শব্দ করছে। ঘরের পূর্ব পাশ দিয়ে সানসেট নাই। জোরে বাতাস এলে সেখান দিয়ে পানির ছিটা এসে গায়ে পড়ে। এছাড়া টিনের চালে অনেকদিন ধরে ফুটিং না দেয়ায় সারা চাল ছিদ্র হয়ে আছে। বৃষ্টি এলে ঘরময় পানি পড়ে। ঘরের পূর্ব উত্তর কর্ণারে যেখানে আমি একটি টেবিল পেতেছি, এখানে ছিল মায়ের রুম। শুধু ঘরের এই স্থানটিতে চাল থেকে পানি পড়ে না। দাদী তার শেষ জীবনে এখানেই ঘুমাতেন। আমি আজ একা। গতকাল পর্যন্ত বাড়ির একটি ছেলে আমার সাথে ঘুমাতো। আজ সন্ধ্যায় তাকে নিষেধ করে দিয়েছি। নিজস্ব কিছু কথা আছে, যা আমি রাত ভর লিখব, এটা অন্য কাউকে আপাতত জানাতে চাই না। ছোট বেলায় আমি ভীষণ ভয় পেতাম। কাচারী ঘর থেকেও একা একা বাড়ি আসতে পারতাম না। সেই আমার রাজনীতি করে এমন সাহস হয়েছিল যে, একদিন আমি ছিনতাই করতে গিয়েছিলাম।

তুফানের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী থেকে উত্থিত বাতাস সরাসরি ঘরের উপর আঘাত হানছে। এর মধ্যে পুরনো এই ঘরটি তিন/চারটা ঝাঁকুনি খেয়েছে। মনে হয় আরেকটা ঝাঁকুনি দিলেই ভেঙ্গে যাবে। খুব সম্ভব অশরীরি কিছু একটা ঘরে ঢুকেছে। নদী থেকে কোন মৎস্যকন্যা উঠে এসেছে কিনা কে জানে ! তার দৃষ্টি হারিকেনের উপর। এর মধ্যে হারিকেনটা দু'বার আপনা আপনি নিভে যাচ্ছিল। আবার একবার খুব জোরে জ্বলে উঠল। সব ক'বারই আমার হস্তক্ষেপের দরকার হয়েছে। মনে হচ্ছে — আগুন নিভাতে পারলেই তার সাথে আমার সওয়াল জোয়াব শুরু হবে। আমার খুব ভয় লাগছে।

www.pathagar.com

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি বেঁচে থাকতে চাই। সহস্র বিপদ অতিক্রম করে হলেও আমি এগিয়ে যেতে চাই। পূর্ব পুরুষের বাস্তুভিটায় আমি একা। সেই আমিও যদি হারিয়ে যাই তবে পুর্ব পুরুষদের নাম নেয়ার মত আর কেউতো থাকলো না! আমি মরে যাব। যেজন্যে কোন দুঃখ নেই। কেবল একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মরতে চাই, যে শূন্য ভিটায় আলো জ্বালাবে। বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে।

সাত.

নরওয়ের অধিবাসীদের মত চরকলমীর লোকদের এখন প্রধান পেশা মাছ ধরা। আর্থিক অবস্থা একটু ভাল এমন প্রত্যেকেরই জাল এবং নৌকা আছে। যাদের কিছুই নেই তারা অন্যের ছান্দি নায়ে বেতনভুক্ত কর্মচারী। রফিক চাচা এক সময়কার সম্মানী মানুষ। এখন অন্যের নায়ে মাছ ধরার নামে মাঝির কাজ করেন।

চরকলমীর উত্তর অংশে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বসতি বেশি। বলা যায় আমিনুল্লা কেরানীসহ ডজন খানেক বাড়ি বাদ দিলে সবই হিন্দু বাড়ি। কচুখালীতে আগে যেখানে গুদারা ছিল তার কাছাকাছি হিন্দুদের শ্মশান ঘাট। দেবি বিসর্জন দেয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। কখনো খেয়া ঘাটের পাশ দিয়ে কখনো কালিগাছ তলা দিয়ে তারা দেবি বিসর্জন দিত। রাশেদের সাথে হিন্দুপাড়ার অনেক ছেলেমেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। গীতা নামের একটি মেয়ে তার ক্লাশমেট ছিল। তার বাপের নাম অনন্ত দাস। এই অনন্ত দাসের সাথে তার নানা অনন্ত পন্ডিতের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কারণ, তিনি কৈবর্তপাড়ায় বিয়ে করেছিলেন। এবং রাশেদের মায়ের বিয়ের সময় অনন্ত, লক্ষীরবাপ, বলাইচন্দ্রসহ এগ্রামের হিন্দুদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করেছিল। এর অন্যতম কারণ কৈবর্তদের মত তারাও ছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দু। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের কাছে তাদের মর্যাদা নিতান্তই কম ছিল। বিয়ে-সাদীসহ বিভিন্ন পূজাপার্বণে হিন্দু পাড়ায় রাশেদের নিমন্ত্রণ থাকতো। গীতার মা, লক্ষীরবাপের স্ত্রী তাকে খুব আদর করতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাশেদ যখন বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র তখন একবার বাড়ি এসে শুনলো যে গীতারা ঘরবাড়ি বিক্রি করে ইণ্ডিয়া চলে গেছে। লক্ষীরবাপ, মাখন বাবু, কবিরাজ কাকা কেউই দেশত্যাগের পক্ষে ছিলেন না। তবু কোন দুঃখে গীতারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে গেল এটা জানা গেল না।

উত্তর পাড়ার হিন্দুদের অবস্থা মোটমুটি ভাল। কারণ, এখন পর্যন্ত তারা নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়েনি। আগে যার যা পেশা ছিল অনেকে সেই পেশাই ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আগে নাগরপুর হাটে লক্ষীর বাপের মিষ্টির দোকান ছিল। সেই হাট বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মিষ্টির দোকান ভেড়ির পাড়ের বাজারে স্থানান্তর করেন। মিষ্টি বানান খাঁটি দুধ দিয়ে, দামও সস্তা। এই বাজারে সবচেয়ে ভাল চলে তার মিষ্টির দোকানটি। তারপর কবিরাজ কাকার ঔষধের দোকান। এই গ্রামের একমাত্র ডাক্তার কবিরাজ কাকা। ছেলেবুড়ো সকলে তাকে

www.pathagar.com

কবিরাজ কাকা বলেই ডাকে। তিনি এই এলাকার সর্বরোগের একমাত্র চিকিৎসক। মাখনবাবু সদরে তহসিল অফিসে চাকরি করেন। এখানকার হিন্দুদের প্রচুর জমিজমা। লেংডিয়ার বিলের প্রায় তিনের একাংশ তাদের।

হিন্দু পাড়ার কিছু কিছু লোক এখন জেলে নৌকায় মাছ ধরার কাজ করে। নদীতে যখন ঝড় উঠে তখন প্রত্যেকের গায়েই কম বেশি আঁচড় লাগে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যেমন ধনী দরিদ্র সবাইকে ছুঁয়ে যায়, এখানকার অবস্থাও সেরকম। চরকলমীর সমস্ত লোকরা যখন জীবিকার তাগিদে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত তখন অল্প সংখ্যক হিন্দুর কি সাধ্য তারা ঘরে বসে থাকে ! টিকে থাকার স্বার্থে কিছু লোককে পেশার পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। মানুষ এমন এক প্রাণী যারা দ্রুত নিজেদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। যাদের জমি কম কিংবা শুধু জমির আয়ে সংসার চলে না তাদের অনেকেই এখন নৌকায় কাজ করে। নিমাই ও রতন কাজ করে হাশেমের নৌকায়। দু'জনই দক্ষ দাঁড়ী। চার দাঁড়ীর নৌকার চেয়ে তাদের নৌকাই আগে চলে। তাদের দাঁড় চাপার ভঙ্গিও আলাদা।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। মজার ব্যাপার হল ইলিশ পুকুরে বাঁচে না। শাপলা ফুল বা দোয়েল পাখি যেমন আমাদের খুব কাছে, ইলিশ ঠিক তত কাছে নয়। জীবিত ইলিশ তো দেশের ৯৯% ভাগ লোকও দেখেছে কিনা সন্দেহ। তবু কেন এটিকে জাতীয় মাছ বলা হয় কে জানে ! ইলিশ না হয়ে যদি শোল বা টাকি আমাদের জাতীয় মাছ হতো তাহলেই বরং ভাল হতো। কারণ ঘরের পাশে যে খানাখন্দ আছে তাতেই এসব মাছ বাচ্চা ফুটায় এবং বেড়ে উঠে। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় এই যে শোল বা বোয়াল মাছ কিন্তু সব সময় পাওয়া যায় না। অথচ বাজারে গেলে সারা বছর ইলিশ চোখে পড়ে। কখনো পরিমাণে বেশি, কখনো একটু কম। হয়ত এই দিকে লক্ষ্য করে ইলিশকে জাতীয় মাছ বলা হয়েছে কিনা কে জানে !

রাশেদের ঘর এখন নদী সংলগ্ন। নদীর ছলাত ছলাত শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গে। শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে যদি একদল গাংচিল উড়ে যায় এখানে বসে তারও শব্দ শোনা যায়। মজার ব্যাপার হল — ঘরের দাওয়ায় যার নদী সে কিনা কোনদিন নদীতে নামেনি। নদীর জলে সাঁতার কাটেনি। ঢাকায় একবার একটি সেমিনারে কবি আল মাহমুদ বলেছিলেন — বাংলাদেশে এমন কোন নদী নেই, যে নদীতে আমি সাঁতার কাটিনি। রাশেদের ইচ্ছে হল — সে নদীতে সাঁতার কাটবে এবং হাশেমের সাথে মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে যাবে। সাঁতারে যে পদক পেয়েছে, নদীতে সাঁতার দিতে তো তার বুক কাঁপার কথা নয়।

মানুষের জীবন তো একটাই। কেবল ঘরে বসে যদি কেউ জীবন কাটিয়ে দেয় — তার জীবন অর্থহীন। একজন মানুষের যতদিন হায়াত থাকে ততদিন তার বিচরণ করা উচিত। দেখা উচিত নদী কেমন, সমুদ্র কেমন, শহর নগর কেমন, বিশ্বচরাচর কেমন। স্রষ্টা এত সুন্দর করে এই জগত গড়লেন আর মানুষ যদি সেই সৌন্দর্য উপভোগই না করলো, তাহলে এই সৌন্দর্যের কোন মানে থাকে না। কোন সুন্দরীর রূপ দেখে কেউ যদি আকৃষ্ট না হলো, তাকে প্রেম নিবেদন না করলো — তবে সেই রূপ অর্থহীন।

মানুষ ফেরেস্তা নয়। তার যেহেতু অনুভূতি আছে, সেহেতু পৃথিবীর সবকিছু একবার চেখে দেখার অধিকার আছে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনো এক গ্লাস মদ পান করেনি, নারী সঙ্গে

www.pathagar.com

কাটায়নি, সে এই জীবনের মর্যাদা কি বুঝবে? রাশেদের জীবন অনেকটা ছকে বাঁধা। সে রাজনীতি করেছে সত্য কিন্তু নিয়মের বাইরে কখনো পা বাড়ায়নি। মাত্র একদিন বাড়িয়ে ছিল তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। অন্যায় করা যাদের নিত্য দিনের অভ্যাস, পাপ তাদের গা সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু একজন সৎ মানুষ ঘুষ খেলেই ধরা পড়ে। তার সম্মান হানি হয়। লোকের কাছে তার মর্যাদা কমে যায়। সর্বোপরি তাকে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হয়। রাশেদ কেবল দগ্ধই হয়নি তাকে জেল খাটতে হয়েছে। এবং জীবনের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। অথচ যারা পাপী, ছিনতাই চাঁদাবাজি যাদের পেশা পুলিশ তাদের টিকিটিও স্পর্শ করতে পারে না।

হাশেমদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর রাশেদের তিন দিন কেটে গেল। এই তিন দিনে সে চরকলমী বাজারে একবার গেছে। তাও হাশেমের সাথে দেখা করার জন্য। এই তিনদিন সে কেবল শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিল। গ্রামের আসার পর প্রথম দিকে যেমন দু'একজন কৌতুহলী দর্শনার্থী তার সাথে দেখা করতে আসতো, এখন তেমন কেউ আসে না। কেবল সময় হলে উত্তর ঘরের দাদী তাকে খাবার দিয়ে যান। রাশেদ সারা দিন ঘরে শুয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে নদীর পাড়ে গিয়ে বসে। এই তিনদিনে কাজ হয়েছে একটি খাতায় কয়েকটা বাক্য লেখা। যে কথাগুলো একদিন তার কাছে বুমেরং হয়ে ফিরে আসতে পারে। কেন লিখলো সে? রাশেদ দৈনিক বিকেলে নদীর পাড়ে বসে আর ভাবে যদি ইয়ানূর একবার আসতো! প্রথম সন্ধ্যায় পিছনে ছপছপ শব্দ শুনেও সে পিছনে তাকায়নি। অথচ এখন সামান্য একটি পাতা নড়ে উঠলেও সে পিছনে ফিরে তাকায়। কিন্তু দৃষ্টি তার কাছে ফিরে আসে। কারণ সারা নদীর পাড় শূন্যতায় খা খা করে। সেখানে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না।

রাশেদ নিশ্চিত ইয়ানূরের যে বিয়ে ঠিক হয়েছে, কথাটা সর্বৈব সত্য। তা না হলে ইয়ানূর অন্তত একবার তাকে দেখতে আসতো। চরকলমীতে বোধ হয় ইয়ানূরই হবে সব চেয়ে শিক্ষিত মেয়ে। তার এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল রাশেদের উপযুক্ত বউ হওয়া। এক সময় তো এলাকার লোকজন তাই মনে করতো। কেউ কোনদিন ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি যে ইয়ানূরের বিয়ে রাশেদ ছাড়া অন্য কারো সাথে হবে।

রাশেদ যেমন সকলের পরিচিত, তেমনি ইয়ানূরকেও সবাই আলাদা ভাবেই জানতো। দু'জনই বাল্যকাল থেকে আলাদা ক্যারিয়ার নিয়ে বেড়ে উঠে। দু'জনের শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল আলাদা। অথচ কত নিষ্ঠুর নিয়তি! দু'জন আজ দুই সীমান্তের অধিবাসী।

একজন নারীর উপস্থিতিতে একজন পুরুষের জীবন অন্যরকম হয়ে যায়। যেন গতিহারা নদীতে আবার নতুন করে বান ডাকে, আবার জোয়ার আসে, আবার কলকল ঢেউ উঠে। নির্জীব দেহে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। ইয়ানূর এতকাল অপেক্ষা করলো! আর সামান্য কয়টি দিন যদি অপেক্ষা করতো! আজ এক অযাচিত প্রাপ্তির আনন্দে তার মন ভরে যেতো। যেদিন সে এই পৃথিবীতে পা রেখেছে সেদিন থেকেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে হারানোর বিষাদময় ঘটনার মধ্য দিয়ে। তারপর তার জীবন থেকে যে যার মত হারিয়েই

www.pathagar.com

গেছে। কেউ আর পিছনে ফিরে একবার তাকানোর চেষ্টা করেনি। হিমালয়ের মত এক বেদনার পাহাড় চেপে আছে তার বুকের উপর। এত দুঃখের পরও যদি ইয়ানূর আসতো ! বাল্যকালে যেমন এসেছিল ! যদি একবার বউ সাজতো ! শৈশবে যেমন সেজেছিল ! আনন্দে ভরে যেতো তার মন প্রাণ। হায় স্মৃতি ! তুমি কেবল কষ্টই দাও। কষ্ট দূর করে দেয়ার শক্তি তোমার নেই !

ইয়ানূর নিশ্চয়ই এর মধ্যে সদরে চলে যায়নি। গেলে অন্তত তাকে একবার বলে যেতো। না বলার মত অপরাধ বোধ হয় এখনো সে করেনি। সেও হয়ত কষ্ট পাচ্ছে। স্বপ্নের মানুষকে পেয়ে হারানোর বেদনায় সে-ও হয়ত ঘুমাতে পারে না। সে-ও নিশ্চয়ই অস্থির চিত্তে রাশেদের পথ চেয়ে বসে থাকে। রাশেদ যদি তার দাদার মত বাঁশি বাজাতে জানতো ! দাদা নাকি বাঁশি বাজিয়েই দাদীকে প্রেমের ডোরে বেঁধে ছিলেন। কৃষ্ণও বাঁশি বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। বাঁশির সুরের উথাল পাথাল মহিমায় তিনি রাধাকে ঘর ছাড়া করেন।

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম, শাম গো
আমারি মত দিবস রজনী জপিতে শ্যাম নাম .....

রাশেদ ঠিক করল — সে কাল বাজারে যাবে। যাবার সময় ভেড়িবাঁধ সংলগ্ন ইয়ানূরদের ঘরে একবার যাবে। তাদের কুশল জানা যাবে। স্বচক্ষে ইয়ানূরকেও একবার দেখা যাবে।

আজ ১লা কার্তিক। আশ্বিন মাসেই বর্ষা শেষ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মত ভাদ্র আশ্বিন মাসেও ঝড় বাদল হয়। মুহূর্তে মেঘ উঠে, হুড়মুড় করে বৃষ্টি চলে আসে কিন্তু কার্তিক মাস এসে গেলে বৃষ্টি-তুফানের সম্ভাবনা প্রায় বিরোহিত হয়ে যায়। রাশেদ বাড়ি আসার পর তিনবার বৃষ্টি হল। দু'বারের পুরো ঝড় বৃষ্টি তার মাথার উপর দিয়ে গেছে। গতকাল গভীর রাতে প্রবল ঝড় হয়েছে, সে সময় সে ঘরে ছিল। অবশ্য প্রতিমুহূর্তে ভয় ছিল। এই বুঝি ঘরটা ভেঙ্গে গেল ! আরেকটু জোরে ধাক্কা দিলেই হয়ত চাল উড়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত ভয় পাওয়াই সাড়। বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি।

ঠিক হয়েছে হাশেম দু'একদিনের মধ্যে তার নাও নিয়ে ফাঁড়িতে যাবে। ফাঁড়ি মানে নদীর মোহনা। তেতুলিয়া ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গলস্থলে কিংবা তার চেয়ে সামান্য দক্ষিণে গেলে ভাল মাছ মারার সম্ভাবনা থাকে। যাদের ইঞ্জিন চালিত নৌকা তারা আরো দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে যায়। হাশেমকে বলা দরকার যে, এবার রাশেদও তার সাথে যেতে ইচ্ছুক। সে নৌকার একজন কর্মী হয়েই যাবে। অন্যরা যা যা করে সেও তাই করবে। একটা বাড়তি সুবিধা এই, অন্যদের যেভাবে পয়সা দিতে হয় তাকে সেটা দিতে হবে না।

কার্তিক মাসের প্রারম্ভ থেকে রাজা শাইল, কার্তিক শাইল কাটা শুরু হয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু যে জমিগুলি সেখানেই কৃষকরা এসব ধান রোপণ করে। আর কার্তিক মাসে বৃষ্টি না হলে এসব জমি দ্রুত শুকাতে আরম্ভ করে। মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধান কাটা শেষ হয়ে যায়। তারপর দ্রুত চাষ দিয়ে এসব জমিতে সবজির বীজ বুনে দেয়া হয়। এসময় কখনো ছিটেফোটা বৃষ্টি হয়, কখনো হয় না। তবে কুয়াশা পড়ে সবদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

আর সমুদ্রে যদি একবার ঝড় উঠেই বসে তাতে দোষের কি আছে। একা হাশেম তো তার নাও দিয়ে যায় না, শয়ে শয়ে নৌকা যায়। ঝড় উঠলে কেবল তাদের নৌকাই ঝড়ের

www.pathagar.com

কবলে পড়বে না। সকলেই পড়বে। তখন অসংখ্য ভাগ্যান্বেষী মাঝি-মাল্লার যে গতি হয়, তারও তাই হবে। এতে পেরেশান হওয়ার কি আছে! তবে স্থলভাগে যদি সামান্য বাতাসে গাছের পাতাও নড়ে উঠে তবু সমুদ্রে সেটা প্রবল বাতাস। আর সেই প্রবল বাতাসের মধ্যে কত মানুষ মাছের সাথে কথা বলে। তাদেরকে চাকসহ নিজের জালে জড়িয়ে ফেলে।

মানুষ আর অন্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রাণীরা কেবল খায়-দায় ঘুমায়। আর শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ বাড়তি আরেকটি কাজ করে, তা'হল — সে নিজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই যে ইলিশ মাছ, তারা বেড়ে উঠছে প্রাকৃতিক ভাবে। তাদের বেঁচে থাকতে হলে শত্রুর পাতা ফাঁদ এড়িয়ে চলতে হয়। প্রতিপক্ষকে চিনতে যার ভুল হয় সেই ধরা পড়ে যায়। নিজের উন্নতি-অবনতি বলতে এখানেই শেষ। কিন্তু মানুষ অনবরত কাজ করে নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তারা মঞ্জিলে পৌছার জন্য সাধনা করে। সফলতা লাভের আশায় অধ্যবসায় করে। মানুষ তার এই সজ্ঞান পরিশ্রমের জন্যই সে মানুষ। তপস্যার জন্যই সে সাধক হয়। বীরত্বের জন্যই ইতিহাসে তার নাম লেখা হয়।

রাশেদ এক সময় মেধাবী ছাত্র ছিল। এখন তো নয়। আগে সকলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছে। এখন কেউ কেউ তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছে। কেউ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। কেউ তাকে উটকো ঝামেলা মনে করছে। বাল্য বয়সে সে খুব ভাল ছাত্র ছিল। তার অর্থ এই নয় যে সে একেবারে আলালের ঘরের দুলাল। সে মাঠে যেতে পারবে না। নদীতে গেলে ডুবে যাবে। সে মূলত এক পরাজিত যুবক। জীবনকে অসাধারণ করে গড়বার সকল সম্ভবনা যার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার এত অহংকার মানায় না। সে মূলত এখানে একটি মুখোশ পরে আছে। এমন ভাবসাব দেখাচ্ছে যেন সে কত কি জানে! ইচ্ছে করলে কত কি করতে পারে! মূলত সে কিছুই জানে না। কিছু করার যোগ্যতাও তার নেই। মুখোশ আছে বলেই লোকজন তাকে বুঝতে পারছে না। মুখোশ খুললেই তার সব ক্যারিশমা ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং এ মুহূর্তে হাশেমের নৌকা মানে তার একটি নতুন চান্স। এই চান্স কখনোই মিস করা যাবে না।

রাশেদ কি পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছে? জেলখানায় বসে সে ভেবেছিল মুক্তি পেলেই গ্রামে চলে যাবে। গ্রাম মানে অনাবিল আনন্দ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। কিন্তু বাল্যকালের প্রাঞ্জল পরিবেশ, উচ্ছল আনন্দ যে বর্তমানে নেই সেটা সে ভাবেনি। মনে হচ্ছিল দাদা-দাদী আছেন, দেবতুল্য পিতা আছেন, সর্বোপরি প্রাণের দুলালী ইয়ানূর আছে। বাড়ির দরজায় মসজিদ। দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিনের সুললিত আহ্বান, সব মিলিয়ে একটি স্বর্গীয় পরিবেশ। অথচ এখানে আসার পর তেমন কিছুই তার চোখে পড়েনি। মনে হয় এখানে সবাই তার অনাত্মীয়, আপনজন বলতে কেউই নেই।

দিন যতই যাচ্ছে, তার হতাশার মাত্রা ধীরে ধীরে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্দী থাকার সময় এত কষ্ট ছিল না। ছাড়া পাবার পরই তার কষ্ট বেড়েছে। একটি মানব শিশু রাস্তার পাশে আগাছার মত বেড়ে উঠে। এখানে সে মুক্ত স্বাধীন। তবু তার কষ্ট, কারণ এখানে তাকে ভালবাসা দেয়ার কেউ নেই। একদিন এক পথিক তাঁকে নিয়ে চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করল। এতেই তার পরমানন্দ। যেহেতু এখানে একজন মানুষ তাকে আদর করছে, তার বেঁচে

www.pathagar.com

থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। রাশেদকে আজ আর আদর করার কেউ নেই। কেউ দরদভরা মন নিয়েও তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। সে প্রতিটি মুহূর্তে সব হারানোর বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে। এর থেকে মুক্তি চাই, বাঁচার জন্য চাই অনাবিল প্রশান্তি। মুক্তি পাবার জন্য এ মুহূর্তে সমুদ্র ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সে গভীর সমুদ্রে যাবে। অতলান্ত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে সে মনের সব যন্ত্রণা দূর করে আসবে।

আজ হাটবার। ভেড়ির পাড়ের বাজারে মঙ্গলবারে হাট বসে। রাশেদ দুপুরের ভাত খেয়ে ধীর পায়ে হাটের দিকে রওয়ানা হল। তার মাথায় কিছু প্ল্যান আছে। সেই প্ল্যান মোতাবেক কাজ করতে হবে। প্রথমে হাশেমের সাথে কথা বলতে হবে। সে কবে কখন যাত্রা করবে এটা সুনির্দিষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। সর্বোপরি ফেরার পথে সে ইয়ানূরের সাথে দেখা করে ফিরবে। ঘর করার কথা না বললেও সমুদ্রে যাবার কথাটা তাকে একবার বলা দরকার। যতদিন সে অন্য কারো ঘরণী না হচ্ছে ততদিন আমার ভালমন্দ তার জানার অধিকার আছে। ঘরটা যেহেতু তার জন্যই সেহেতু সেটাকে উহ্য রাখতে হবে।

হাশেম জানালো যে, আসছে শুক্রবার একটি শুভদিন। ঐ দিন ফজরের নামাজের পরপরই তাদের নৌকা ছাড়বে। এর মধ্যে মিলাদ পড়ানোর কাজটাও সেরে নিতে হবে। একটি ছোট ইলিশ জালের নৌকা চালাতেও কম পক্ষে সাত/আটজন লোক লাগে। তার মধ্যে একজন থাকে পানি সেচ ও ভাত রান্নার জন্য। অল্প বেতনের এরকম একজন ছেলে দরকার। একটি ছেলে আসবে বলেছে কিন্তু সে মাসোহারা বেশি চায়। রাশেদ বলল — চিন্তার কারণ নেই। রান্নাবান্নার কাজটা আমি করব। কারণ আমি ভাল রান্না করতে জানি। কলেজ হোস্টেলে অনেকদিন রান্না করে খেয়েছি। আর পানি সেচের কাজটাও আমাকে একবার দেখিয়ে দিলেই চলবে।

: তুই করবি এই কাজ — বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল হাশেম।

: কেন তাতে দোষের কি?

: দোষের কথা বলছি না। নদীতে যেতে চাস ভাল কথা, কিন্তু বয়ের কাজ করতে হবে, সেটা কেন?

: কাজ করেই খেতে হয়। কাজ করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

: যারা বলে কাজ করার মধ্যে লজ্জা নেই, তারাই বড় বড় কাজ করে। ছোট কাজ গুলো ফেলে রাখে অন্যের জন্য। একজন উচ্চ পদস্ত ব্যক্তি কখনো মেথরের কাজ করে না। কাজ করার মধ্যে লজ্জা আছে বলেই তারা সেটা করে না।

: আমি রান্না করাটাকে পেশা হিসেবে নিচ্ছি না। It is only Experiment, ক্লাসিক্যাল থিওরীতে যে ভদ্রলোক (এক ডব্লিউ টেইলর) ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রদান করছেন, তিনিও জীবনের শুরুতে একটি কারখানায় অবৈতনিক শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করেন। ধরো, জাফরুল্লা চৌধুরীর মত আমিও যদি একজন বড় মাছ ব্যবসায়ী হতে চাই, তাহলে সে কাজ তো আমাকে প্রারম্ভ থেকেই জানতে হবে। একজন জেলে কত কষ্ট করে রাত জেগে মাছ মারে এটা যদি আমি স্বচক্ষে না দেখি তাহলে তার কষ্টটা আমি বুঝব কিভাবে!

: তোর কথার উপর দিয়ে কিছু বলার সাহস আগেও আমার ছিল না, এখনও নেই।

www.pathagar.com

: আমি শুক্রবার খুব সকালে ঘাটে উপস্থিত থাকব। তবে শর্ত হচ্ছে আমিসহ আটজন। তার বেশি কোন লোক নেয়া যাবে না।

: ঠিক আছে। তুই যা ভাল বলিস তা-ই হবে।

আলমগীরকে ফ্রী পাওয়া দুষ্কর। হাটবারে তার ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায়। নানান ধরনের লোকজন আসে। কেউ আসে ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলতে, কেউ আসে সুদের উপর দাদন নিত, কেউ আসে সামাজিক সমস্যা নিয়ে। প্রত্যেক হাটবারে সন্ধ্যার পর তার নিজস্ব নৌকার মাঝিদের নিয়ে বৈঠক হয়। এবং সপ্তাহে একদিন তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিতে হয়। আর নতুন কোন সমস্যা হলে সেটাও বলতে হয়। সেজন্যে সন্ধ্যার পরে তার কাজের চাপ আরে বেড়ে যায়।

এই সময়ে তাকে একান্তে পাওয়া দুঃসাধ্য। যা বলার সন্ধ্যার আগেই বলতে হবে। সে আলমগীরকে কথাটা বাড়িতেও বলতে পারে। কারণ আলমগীর মাঝে মাঝে বাড়ি যায়। রাত বারটায় বাড়ি গেলেও সকাল নয়টা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। আলমগীরের বাজারে সংলগ্ন ভেড়িবাঁধের অনুকূলে একটি মনোরম বাড়ি করেছে। ঠিক ফ্লোরিডা সমুদ্র সৈকতে নির্মিত মাইকেল জ্যাকসনের প্রমোদভবনের মত। পার্থক্য এই সেটা সুরম্য প্রাসাদ। আর এটি টিনের একটি চার চালা ঘর। চারদিকে পরিষ্কার বাগান। নারিকেল-সুপারি গাছগুলি সবে মাত্র বেড়ে উঠতেছে। কলা গাছগুলিতে লম্বা লম্বা কলার কাঁদি দর্শকের দৃষ্টি কাড়ছে। মুখ দক্ষিণ দিকে করা ঘর। বারান্দায় বসলে দক্ষিণা বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। রাশেদ গ্রামে ফিরে আসার পর আলমগীর এক বিকেলে তাকে নতুন বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। রাশেদ খুব চমৎকৃত হল। ভেড়িবাঁধের পাশ ঘেঁষে অগণিত নদী ভাঙ্গা মানুষের পর্ণকুটির, বেশুমর হাড্ডিসাড় ছেলে মেয়ে। কুৎসিত গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে আসে। তার মধ্যে মনোরম একটি বাড়ি যেন অসংখ্য দাসী ব্যষ্টিত একজন রাজকন্যা, যার অপরূপ রূপলাবণ্য সহজেই অচেনা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাশেদ গ্রামে আসার পর আলমগীর একদিন তাকে নিয়ে গিয়েছিল সে বাড়িতে। বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে আলমগীর বলল —

: ভাইয়া, তুমি যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলতে পারি।

: বল।

: তুমি ইচ্ছে করলে এবাড়িতে থাকতে পার। যতদিন দেশে থাক, ততদিন থাকবে।

: রাতে একা একা থাকতে খুব ভয় লাগে।

: ভয় লাগলে আমার লোকজনকে বলে দিব। তারা তোমার সাথে থাকবে।

: না আলমগীর, এমনিতেই আমি খুব খুশী। তোর প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। যতদিন থাকি নিজের বাপ-দাদার ভিটাতেই থাকি। একা থাকার চেয়ে বাড়ি সকলের সঙ্গে একত্রে থাকব।

আলমগীর নিজে কেন ঐ বাড়িতে রেগুলার থাকে না এটা অবশ্য জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করলেই বরং ভাল হতো। কারণ ঐ বাড়ি দেখার পরে এই কথাটা বারবার তার মনে জেগেছে। কিন্তু প্রসঙ্গহীন প্রশ্ন করা তো ঠিক নয়। এজন্য বিষয়টা অজানাই থেকে গেছে। আজ আবার কেন যেন সেই কথাটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করছে।

www.pathagar.com

আলমগীর গদিতে বসে আছে তার সামনে ক্যাশবাক্স। গদির পাশেই রাশেদকে চেয়ার দেয়া হয়েছে। সে ওখানেই বসে আছে। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে লোকজন একটু হালকা হল। রাশেদ বলল —

: আলমগীর, তোর সাথে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল। লোকজনের চাপের জন্য বলতে পারছি না।

: লোকজনের চাপ থাকবেই, এর ভিতরেই তোমার কথা সারতে হবে।

: বলছিলাম কি, আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।

: ও এই কথা ! এই কথা বলার জন্য তুমি এত কষ্ট করে এখানে বসে আছ ! সকালে ঘরে ডাকলেই পারতে।

: ঘরেই বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টাকার কথা বলতে কেন যেন খুব লজ্জা লাগছিল। জীবনে কখনো তো কারো কাছে হাত বাড়াইনি !

: এখানে তো হাত বাড়ানোর কিছু নেই। তোমার জমি জমা আছে। প্রতি বছর সেখান থেকে একটা আয় আসে, সেটা তো আমার কাছে জমা আছে। ভাইয়া একটা কথা শোনো, লোকজন আমাকে যতটা খারাপ ভাবে ততটা খারাপ আমি নই। ব্যবসা বাণিজ্য করতেগেলে একটু আঙ্গুল বাঁকা করা লাগে। ব্যবসা ঠিক রাখতে গেলে এটা না করে ব্যবসা করা যায় না। নতুবা দেখা যাবে এক সপ্তার মধ্যে সমস্ত ক্যাশ লাটে উঠেছে।

: আমি ব্যবসা বাণিজ্য বুঝি না, বুঝার ইচ্ছাও আমার নেই। ক'দিন রাজনীতি করেছি তাতেই দেখেছি নেতা হতে গেলে কত দুই নম্বরী করা লাগে।

: তা টাকা কিজন্য নিতে চাও? আমি কিন্তু কৈফিয়ত তলব করছিনা, ভাইয়া। স্রেফ তোমার প্ল্যানটা শুনতে চাই। কাউকে উদার হস্তে দান করলে দেখা যাবে সে পুরো টাকাটা গিলে বসে আছে।

: কাউকে দিব না, এটা আমারই লাগবে।

: কি করবে?

: একটা বাড়ি করব। পুরাতন বাড়ির বিপরীত দিকে দাদার যে আধা কানি জমি আছে, সেটার উপর আমি একটা বাড়ি তুলতে চাই।

: কষ্ট করে নতুন বাড়ি করার দরকার কি, তুমি ইচ্ছে করলে আমার নতুন বাড়িতেই থাকতে পার।

: আমি চাই তোর মত আমারও একটা বাড়ি হোক। সে বাড়িতে শুধু একটা ঘর হবে না। পুরান বাড়ি থেকে ছোট দাদাসহ যারা আসতে চায় তারা প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছে মত ঘর তুলেতে পারে। আগামী বর্ষা পর্যন্ত পুরাতন বাড়িটা থাকে কিনা সন্দেহ। তার আগেই প্রত্যেকেরই নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া দরকার।

: ও আচ্ছা — আলমগীর সহজ ভঙ্গিতে হেসে ফেলল। এই সহজ হাসির মধ্যে একটা কুটিলতা লুকিয়ে ছিল যা রাশেদ ধরতে পারেনি।

: আলমগীর বলল — ভাইয়া তোমার কিন্তু একখন্ড জমি না। পূর্ব কান্দির হন্নাত বাড়ির কাছে আছে চারকানী, দাসের দাঁড়িতে আছে এক কানি, লেংডিয়ার বিলে আছে এক

www.pathagar.com

দরুণ, এছাড়া ঢালচর ও চরমনোহরেও বেশ কিছু জমি আছে। তুমি ইচ্ছে করলে সব জমিই বুঝে নিতে পার।

: তার দরকার নেই। আপাতত তুই আমাকে বাড়ির কাজ করার জন্য আধা কানিই ছেড়ে দে। আর কিছু টাকা দে। আমি কাজ স্টার্ট করি। তারপর যা করার করব।

: এখন তাহলে কত টাকা দিব ?

: হাজার বিশেক দে।

: ভাইয়া, আমি জানতাম তোমার কিছু টাকার দরকার। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে বাড়ি করতে চাও সেটা ভাবিনি। তুমি স্থায়ীভাবে থেকে গেলে ভালই হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ গ্রামের নানান জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা, যা আমার একার পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব না। লেখাপড়ার দৌড় বেশি না হওয়াতে মাষ্টাররাও আমার কথা শুনে না। তাছাড়া এখানে একটি হাইস্কুল দরকার। তুমি আছো, ইয়ানূর আছে সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা হাইস্কুল দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তোমার জন্য আমি হাজার বিশেক টাকা জোগাড় করে রেখেছি। তুমি এখনই নিতে চাইলে এমুহূর্তে দিতে পারি।

: তোর এই দূর দৃষ্টির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত তুই একদিন বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবি।

: তুমি দোয়া করো ভাইয়া।

: টাকাটা দিলে আমি কালই লোকজন ঠিক করতে পারি। আসছে শুক্রবার সকালে থেকেই মাটিয়ালরা ভিটি তৈরির কাজ শুরু করতে পারে।

আলমগীর দশ হাজার টাকার দু'টো বাণ্ডিল রাশেদের দিকে এগিয়ে দিল। রাশেদ একটি সাদা কাগজে লিখল — আমি আলমগীরের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নিলাম। পরে সিগনেচার ও তারিখ। রাশেদ মনে মনে খুব খুশি হল এই ভেবে যে, তার সবগুলো পরিকল্পনাই সফল হচ্ছে। এখন কেবল বাকি আছে ইয়ানূর। সে এখনি বাড়ি রওয়ানা হবে। যাবার পথে ইয়ানূরের সাথে দেখা করে যাবে। যদি সম্ভব হয় তাকেও নতুন বাড়ি নির্মাণের কথাটা বলে যাবে।

রাশেদ হাঁটছে। আনন্দে তার বুক ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে টাকা এক ধরনের টনিক ! টনিক সেবন করলে একজন দুর্বল মানুষও যেমন সোজা সবল হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেও আজ তেমনি সবল-শক্তিমান। মনে হচ্ছে এতদিনের আড়ষ্টতার পর আজ প্রথম নববসন্তের পত্র-পল্লবে নতুন হিল্লোল বইতে শুরু করেছে। দুই পকেটে বিশ হাজার টাকা। বিশাল ব্যাপার ! সে বড় ঘরের ছেলে বটে কিন্তু এক সাথে এত টাকার মালিক সে কোন দিন ছিল না।

ইয়ানূর ঘরেই ছিল। হঠাৎ রাশেদকে দেখে যেন আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। রাশেদ তার মনের মানুষ, তার স্বপ্ন। একদিন তার কোন প্রয়োজন হয়নি। তবু ইচ্ছে হলেই সে রাশেদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতো। আজ রাশেদ একা। তাকে একটু সঙ্গ দেয়া, একটু সান্ত্বনা দেয়া কত দরকার ! অথচ আজ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর কোন উপায় নেই। কত নিষ্ঠুর এই পৃথিবী ! কত নির্মম এই সমাজ ব্যবস্থা !

www.pathagar.com

ইয়ানূরের মা সুফিয়া বেগম এসে বললেন — সেই এলেতো বাবা, তাই বলে তিনদিন পর ! তিনদিন পর আমাদের কথা তোমার মনে পড়ল? ইয়ানূর বলল — ভাইয়া তো সব সময়ই লেইট। লেইট করে তো সে জীবনে কম কিছু হারায়নি। রাশেদ বলল — এবার থেকে আর লেইট হবে না। যখন যা করার দরকার হয়, ঠিক সময় মত করে ফেলবো। ইয়ানূর বলল — আমি দোয়া করি তা-ই যেন হয়। সুফিয়া বেগম বললেন — তোমরা কথা বল। আমি দেখি তোমাদের দেয়ার মত ঘরে কিছু আছে কিনা ! এই বলেই তিনি চলে গেলেন। রাশেদ বলল —

: আজ একটা ভাল সংবাদ আছে। ভাল হলেও তোমাকে বলতে সাহস পাচ্ছি না। যদি রেগে যাও !

: কি এমন কথা যে বলতে প্রচুর সাহসের দরকার।

: অভয় দিলে বলতে পারি।

: ভাইয়া, তোমার যা ইচ্ছা বলতে পার। যদি বল — আমার সঙ্গে সহমরণে চল, আমি এক পায়ে খাড়া। শুধু তোমার বলার দেরি।

: সে রকম কিছু নারে..... ! সেটা বলতে পারলে তো এই জীবনে আর কোন দুঃখ থাকতো না।

: দুঃখ তো কম করনি, এখানেই কেন বা দুঃখের সমাপ্তি টেনে দাও না?

: মানুষের সাধ্যের অতীত কিছুই করার থাকে না।

: ভাইয়া, তুমি কি বলতে চাও, কথাটা আমাকে একবার খুলে বলোতো?

: ইয়ানূর তোমার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি ঘর তৈরির কাজে হাত দিচ্ছি।

: ঘর তৈরি হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমাকে ঘরে তুলবে। তুলবে তো !

: তোমাকে বাদ দিয়ে অন্য সবাইকে তুলব।

: কেন, আমি কি দোষ করেছি?

: দোষের কিছু না, তোমাকে তুলব ঠিকই কিন্তু রাখবো না। অন্যরা থাকবে, কেবল তুমি থাকবে না।

: ভাইয়া, তুমি কি আমার সম্পর্কে কোন কথা শুনেছো?

: শুনব না কেন? তুমি এ গ্রামের শ্রেষ্ঠ মেয়ে। শ্রেষ্ঠ হলে এই এক সমস্যা, যে কোন ঘটনাই আর লুকিয়ে রাখা যায় না। কেউ না কেউ জেনে ফেলে। পরে সেটা একান-ওকান হয়ে সকলের কানে পৌঁছে যায়।

: ভাইয়া — ইয়ানূর কাঁদতে শুরু করেছে। এমন সুন্দরী একটি মেয়ে রাশেদের সম্মুখে বসে কাঁদছে। তার খুব অস্বস্তি লাগছে। ইয়ানূর দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে তার সবচেয়ে গোপনীয় বিষয়টি রাশেদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। ইয়ানূরের ডান হাতে একটি আংটি। এটি নিশ্চয়ই ফিরোজের দেয়া। রাশেদ ছোট করে একটি নিশ্বাস ফেলল।

: ইয়ানূর, আমি রফিক চাচার সাথে কথা বলতে এলাম। বাজারে খুঁজে তাকে পেলাম না। কিছু টাকা পাওয়া গেছে। এই টাকা দিয়েই আমি শুক্রবার সকাল থেকে ঘরের কাজ শুরু করতে চাই।

www.pathagar.com

: আব্বাকে কেন দরকার?

: টাকাগুলি ওনার হাতে দিতে চাই। ভিটির জন্য কতটা মাটির দরকার হয়, কয়টা গাছ কিনতে হয়, এসব ব্যাপার তো উনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন।

: তুমি ওনার কাছে এসেছো?

: শুধু ওনার কাছে না। তোমার কাছেও এসেছি।

: ভাইয়া, আমার কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

: নাহ! কদাচিৎ মনে হলেও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

: সত্যি বলছো?

: ইয়ে, একটা কাজ করো। দেখোতো চাচী কি নাস্তা তৈরি করেছে?

: আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

: উত্তর পরে দিব। আগে নাস্তা নিয়ে এসো।

ইয়ানূর মিঠাই মুড়ি এনে রাশেদের সামনে রাখতে রাখতে বলল —

: ভাইয়া, তোমার টাকার উৎসটা কি?

: নিষিদ্ধ জায়গা।

: তার মনে তুমি আলমগীরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছো?

: হ্যাঁ। তবে একটা কথা। টাকাগুলো আমি কর্জ হিসেবে নেইনি। দীর্ঘদিন ধরে আমার জমি গুলি তার দখলে, সেটার নিশ্চয়ই একটা আয়-ব্যয় আছে। আছে না?

: আছে বৈ কি। তবে একটা কথা জেনে রাখো ভাইয়া, আলমগীর একদিন তোমার কাছ থেকে এই টাকা সুদে আসলে আদায় করবে।

: তুই আমাকে এত বোকা ভাবিস নাকি?

: বিবেকবান মানুষরা বোকাই হয়। তারা Exploited হয় ঠিকই কিন্তু বিবেকের কারণে নিজেরা Exploit করতে পারে না।

: Exploit-এর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করতে পারে।

: প্রতিরোধ করতে না পারলে আজকাল শুধু প্রতিবাদে কাজ হয় না।

: সময় হলে তা-ও করতে পারব। আচ্ছা ইয়ানূর, একটা বিষয় আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। সেটা হল — আলমগীরের কথা উঠলেই তুমি ক্ষেপে উঠো কেন? আমি অনেক কথাই লোকমুখে শুনেছি কিন্তু তোমার রাগের কারণটা কেবল জানা হয়নি।

: আমার রাগের কারণ জানতে চাও?

: হ্যাঁ চাই।

: তাহলে তুমিও রেগে যাবে।

: রাগব না। আমি খুব সহজে রাগি না। তবে রাগ একবার উঠে গেলে কারো আর রেহাই নেই।

www.pathagar.com

: আলমগীর একবার বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল — এটা তুমি জান?

: হ্যাঁ জানি। একটি স্বাধীন দেশে যে কেউ প্রস্তাব পাঠাতে পারে। প্রস্তাব রাখা না রাখা প্রতিপক্ষের ব্যাপার।

: সে শুধু প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। আমাকে হাত করার জন্য হেন কাজ নেই যা সে করেনি। তার একটি প্রমোদভবনের কথা নিশ্চয়ই তুমি জান।

: জানি। এককালে জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল। যেমন বঙ্গভবন ছিল নওয়াবদের বাগানবাড়ি। অনেক বড় লোকেরই ডাকবাংলো থাকে। আলমগীরেরও আছে।

: সেখানে সে যা ইচ্ছা তা–ই করে। একবার একজন বড় মাছ–ব্যবসায়ী খুন হয়েছিল ঐ বাড়িতে। ফিরোজের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল বলে রক্ষা, নতুবা আমাকেও একবার যেতে হতো তোমার চাচাতো ভাইয়ের সেই প্রমোদভবনে।

: তাই নাকি?

: শুধু তা–ই নয়। আমরা পারিবারিক ভাবেও বহু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। আমার বাবা ভাল একটি কাজ করতে পারে না। যেখানে যায় সেখানেই সে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণেই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। আমি তো গ্রামেই আসি না, কেবল তোমার ফিরবার কথা শুনে এসেছি। ভেবেছি — তুমি থাকলে সে আমার দিকে তাকাবারও সাহস পাবে না।

: ইয়ানূর আমি এখন উঠব। উঠার আগে ঘর করার আসল উদ্দেশ্যটা তোমাকে বলতে চাই। তোমাদের ঘর নেই, আমারও নেই বললেই চলে। নতুন বাড়িটা করে আমি রফিক চাচাসহ সবাইকে ঐ বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। কারণ, তোমরা ছাড়া তো আমার আপনজন আর কেউ নেই। ঘরটা উঠে গেলেই তোমার বিয়ের আয়োজন করব। তোমাকে তুলেও দিব ওখান থেকেই। তারপর রফিক চাচা, হাশেম আমি সবাই মিলে চেষ্টা করব নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কিছু করা যায় কিনা। সবগুলো কাজ করতে হবে অতীব ধৈর্যসহকারে। আরেকটা কথা — আমি যে টাকাটা নিয়েছি এটা আমার পাওনা। সব গুছগাছ হয়ে গেলে শেষে জমিগুলো নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসব। আলমগীর সম্পর্কে তোমার যে ক্ষোভ সেটা এখন মনের গহীনে চাপা দিয়েই রাখতে হবে।

হঠাৎ দরজার কাছে গলা খাকারী হল। ইয়ানূর বলল — আব্বা এসেছে। রফিকুল ইসলাম ঘরে ঢুকে বললেন —

: কখন এসেছো রাশেদ?

: কিছুক্ষণ আগে এলাম।

: তোমার সাথে দেখা হয় না, কিছু কথা বলা দরকার। সময়ের অভাবে বলতে পারি না। পরের চাকরী করি। তার খেয়াল খুশিমত চলতে হয়।

: চাচা, আপনার কথা পরে শুনব। আজ আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে এসেছি। আমার কাছে হাজার বিশেক টাকা আছে। এটা আপনার কাছে রাখতে চাই।

: টাকার দায়িত্ব আমাকে দিও না। এমনিতে অসহায় মানুষ। তার উপর ঘর দরজা নেই। আজকাল মানুষের আচরণ এমন হয়েছে যে, তারা শয়তানকেও হার মানায়।

: নতুন বাড়ির কাজটা আপনার তত্ত্বাবধানে শুরু করতে চাই।

www.pathagar.com

: হ্যাঁ তোমার নতুন পরিকল্পনার কথা সেদিন ইয়ানূরের মুখে শুনেছি। কিন্তু বাবা একটা কথা না বলে পারি না। যেখানে আলমগীরের স্বার্থ জড়িত সেখানে আমি থাকতে চাইনা। ঐ জমিটা এখনো আলমগীরের দখলে। সে এত তাড়াতাড়ি সেটা হাতছাড়া করবে কিনা সন্দেহ। টাকার দায়িত্ব তুমি অন্য কাউকে দাও। এছাড়া আর কিছু করার দরকার হলে আমি দেখব।

: আমি কাল পরশু বাড়ি থাকব। শুক্রবার খুব সকালে হাশেমের সাথে ইলিশ ধরা দেখতে যাব। ফিরতে চার-পাঁচ দিন লাগবে। বেশিও লাগতে পারে।

: ফিরে এসেই কাজ শুরু কর। তুমি না থাকলে কার কাজ কে করে।

: আপনি তাহলে বিশ-ত্রিশ জন মাটিয়াল ঠিক করে দেন। কাল তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাই। যাতে শুক্রবার সকাল থেকে তারা কাজ আরম্ভ করতে পারে। টাকার দায়িত্বটা আপাতত ছোট দাদাকে দিয়ে যাই। তিনি লেবারদের বিল পরিশোধ করবেন।

: যা ভাল বুঝ করতে পার। তবে যা করবে বুঝে শুনে সতর্কতার সাথে করবে। বিপদের তো হাত পা নেই।

: আপনারা যখন আছেন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিলেই চলবে। আজ তাহলে যাই চাচা।

: ঠিক আছে। খোদা হাফেজ।

রাশেদ সোজা ছোট দাদার দোকানে চলে এলো। ছোটদাদাও তখন ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি যাবেন ভাবছিলেন। রাশেদকে দেখে খানিকটা অপেক্ষা করলেন।

ছোটদাদা রাশেদের সব প্ল্যান প্রোগ্রামের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। রাশেদ তার দাদার হাতে টাকাটা তুলে দিয়েই ঘরে ফিরলো। এবং দাদীর দেয়া ভাত-তরকারী খেয়ে সহসা ঘুমিয়ে পড়ল।

আট.

নিরব নিস্তব্ধ একটি রাত। নদীর পাড়ে ঘর, অথচ বাতাস না থাকায় একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। সন্ধ্যার আকাশে সরু চাঁদ ছিল। এখন সেটা নেই। হাজার হাজার তারা জ্বলজ্বল করে আলো দিচ্ছে। একটি সময় ছিল যখন এ বাড়িতে ঝোঁপঝাঁড় ছিল। চারদিকে অরণ্যের মত বাগান ছিল। চাঁদ না থাকলে চারদিকে থাকতো ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাপ-শিয়ালের ভয়ে কারো পক্ষে লাইট বা হ্যারিকেন ছাড়া বের হওয়ার উপায় ছিল না। এখন আকাশে চাঁদ নেই, তবু চারদিকে ফর্সা আভা। বোধ হয় পানিতে যে সুপ্ত বিদ্যুৎ থাকে, সেই অপরিসীম বিদ্যুৎ আবছা একটা আলো সারা তটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দূর দিয়ে কেউ হেটে গেলেও বোঝা যাবে সে মানুষ না অন্য কিছু।

রাশেদ সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিল। একদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ সারতে যাবার কারণে তাকে প্রচুর খাটুনি খাটতে হয়েছে। রফিক চাচা এবং ছোট দাদার সহযোগিতায় সে

www.pathagar.com

কাজগুলো সম্পন্ন করেছে। জমি মাপ দিয়ে চার কর্ণারে চারটি পিলার কুপে দিয়েছে। ম্যাপ অনুসারে দেখা গেল জমিটার পশ্চিম দিকের তুলানায় পূর্বদিক সরু। খতিয়ান ও ম্যাপ অনুসারে যতটুকু জমি তার পাওনা ততটুকুই সে বুঝে নিয়েছে। এই জমিটার দক্ষিণপাশ ঘেঁষে আলমগীরের ত্রিশ শতাংশ জমি আছে। জমি মাপার সময় আলমগীরকে দু'বার ডেকে পাঠানো হয়েছে। সে আসেনি। বলেছে খতিয়ান অনুসারে মেপে নিলে তার কোন আপত্তি থাকবে না। আলমগীর ছাড়া আশ–পাশের জমির মালিক যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিল। এমন কি আহমদুল্লা মৌলবী সাহেবের ছেলে হোসেন মৌলবী এসেও রাশেদের কাজে উৎসাহ দিলেন। হোসেন মৌলবী এবং ছোট দাদার কথা অনুসারে ঠিক হল — ঘর দক্ষিণমুখী রাখা হবে। পশ্চিম দিকে বাড়ির রাস্তা আর পূর্ব দিকে পুকুর থাকবে। অতপর ঘরটা কতবড় হবে কি পরিমাণ মাটি কাটতে হবে, কতজনে মাটি কাটার কাজ করবে সব ঠিক হয়ে গেল। যেহেতু আগামীকাল থেকে ক'দিনের জন্য রাশেদ থাকছে না, সেহেতু কে কি কাজ তদারকী করবে এটাও সে ঠিক করে দিল। রাশেদ স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকছে এটা ভেবে অনেকে খুব খুশী হলো। কেউ বলল — এতদিনে চরকলমী একজন আসল লোক খুঁজে পেলো। এবার থেকে এখানকার মানুষ একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

অন্যান্য দিনের মত আজ রাতেও রাশেদের তেমন ঘুম আসছে না। এতদিন দুশ্চিন্তা ছিল, আজ ঠিক সেটা নয়। আবার ঠিক আনন্দও নয়। কি রকম যেন একটা অস্থিরতা তার মধ্যে কাজ করছে। সারা দিন কাজ করেছিল বিধায় রাশেদ রাত দশটার দিকে চারটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ধারণা ছিল শরীর অবসন্ন বিধায় রাতে ভালই ঘুম হবে। কার্যত তা হলো না। রাত বারটার দিকে কোন কারণ ছাড়াই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কতক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। তাতেও কাজ হলো না। তার একবার ইচ্ছে হলো — সে কিছু কথা লিখে রাখে। এই কয়দিনে যা ঘটলো, সেটা লিখে রাখলে মন্দ হয় না। সে বিছানার নীচ থেকে খাতা কলম বের করলো। কি লিখবে সে? কোথায় থেকে শুরু করা যায়? সে হাশেমের সাথে সমুদ্রে যাচ্ছে। আলমগীর তাকে টাকা দিয়েছে। আলমগীর সম্পর্কে ইয়ানূরের মনোভাব, সর্বোপরি বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত। এবং সে অনুসারে কাজ শুরু — এসব কি লিখে রাখা যায়? সে ভাবলো লেখার আগে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। সম্ভব হলে মাথায় একটু পানি দিবে। তারপর লিখতে বসবে।

ঘরের খুব কাছেই পুকুর। পুকুর মানে নদী, এর অর্ধেকটা অনেক আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখন নদীতে জোয়ার এলে ঘোলা পানিতে পুকুর ভরে যায়। আবার ভাটা পড়লে শুকিয়ে যায়। ঘর সংলগ্ন পুকুর ধারে আগে যে বাঁকা আতাফল গাছটা ছিল। সেটা এখনো আছে। মনে হয় গাছটা আগের চেয়ে বুড়িয়ে ছোট হয়ে গেছে। একটি বাঁকা আতাফল গাছ অথচ কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রাশেদ অন্ধকারে দরজা খুলে বের হল। সে এগিয়ে গিছে গাছটির গোড়ায় বসল। সেই হাসি, সেই উচ্ছলতার দিনগুলি যদি আবার ফিরে আসতো ! সে গাছটির গোড়ায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো। খেয়াল করে দেখলো গাছের যে মোটা ডালটা উপরের দিকে উঠেছে, শুধু সেটা রেখে অন্যগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। তবু শুকুরিয়া যে, পুরো গাছটা কেটে ফেলা হয়নি। এমন ওতো হতে পারতো — সে বাড়ি এসে দেখতো তাদের বাড়ি ঘর বলতে কিছুই নেই। সবই নদীর জলে ভেসে গেছে। একদিন হোক

www.pathagar.com

বা এক মাসের জন্য হোক সে তার পূর্ব পুরুষদের ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। ক'দিন রাত কাটিয়েছে। এটা না পেলইবা সে কি করতে পারতো!

বাড়ির দু'টো ঘর না থাকায় দক্ষিণ দিকটা খালি। বালক বয়সে দেখা দেবিপুরের তালুকদার বাড়ির মত অবস্থা। নদী ঐ বাড়ি কাছাকাছি আসার পর একে একে ঘরগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এত সুন্দর সম্ভ্রান্ত বাড়ি অথচ কয়েকটা ঘর ভেঙ্গে ফেলার পর মনে হল — ভিটিগুলি শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। মানুষের পরশ না পেলে সব কিছুই কেমন শ্রীহীন হয়ে যায়!

আবছা আলোয় ঘড়ির কাঁটা দেখা যায়। রাশেদ দেখলো রাত দুইটা বাজে। সে উঠে ঘরে যাবে ঠিক সেমুহূর্তে মনে হলো পূর্ব দিকের পথ বেয়ে কেউ একজন আসছে। কে হতে পারে? আলমগীর নয় তো? সে-ই তো সবচেয়ে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরে। আরেকটু কাছে আসার পর মনে হলো — এতো পুরুষ নয়, মহিলা। এতরাতে কে হতে পারে? সালোয়ার কামিজ নয়, শাড়ি পরিহিত। বাড়ি ঢুকেই সে সোজা রাশেদের ঘরের দিকে চলে এসেছে। রাশেদ যে একটু দূরে বসে আছে এটা তার চোখে পড়েনি। বোঝাই যাচ্ছে নতুন চোর। চুরির পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। রাশেদের বুঝতে বাকী রইল না, এ আর কেউ নয়, ইয়ানূর। কিন্তু কেন সে এত রাত ঘরে আসবে? যদি কেউ টের পায়? যদি কুৎসা রটায়! যে কারণে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। ইয়ানূর, হায় ইয়ানূর! আলমগীর কত চেষ্টা করেও তোমাকে প্রমোদ ভবনে নিতে পারেনি। অথচ এখানে কেউ ডাকেনি, তবু এই গভীর রাতে আমার ঘরে তুমি সশরীরে উপস্থিত! মানুষের প্রতি মানুষের কত বিশ্বাস! রাশেদ ধীর পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

পিছনে হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজ পেয়ে ইয়ানূর যেন একটু চমকে উঠল। রাশেদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল — এত রাতে তুমি? কোন সমস্যা হয়নি তো?

: সমস্যা তো একটা হয়েছে। নতুবা রাত নিশীথে এলাম কেন?

: কি ব্যাপার, বলতো?

: এসেছি যখন নিশ্চয়ই বলব। তার আগে কপাল থেকে চোখ নামিয়ে একটু সহজ হয়ে বসো।

রাশেদ হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে দিল। যাতে দু'জন দু'জনের মুখ স্পষ্ট দেখতে পারে। দেখা গেল ইয়ানূর তার মায়ের একখানা আটপৌড়ে শাড়ী পরে এসেছে। তাকে দেখে মনে হয়না কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাশেদের কাছে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয় — ইয়ানূর কেন এত রাতে তার কাছে এসেছে? রাশেদ বলল — তুমি যে এসেছো, তোমাদের ঘরের কেউ কি জানে?

: হ্যাঁ জানে।

: কে জানে?

: শুধু মা।

: ওনাকে নিয়ে এলে না কেন?

www.pathagar.com

: মা থাকলে সব কথা বলা যাবেনা, এজন্য আনিনি।

: আস্তে কথা বল। লোকজন জেনে ফেললে এই গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।

: আমি তো পালাতেই চাই।

: তার মানে?

: ভাইয়া, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিছু কথা বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু আমি যে মেয়ে মানুষ। ভাইয়া, তোমার পায়ের কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দাও। কথাটা শেষ না হতেই ইয়ানূর রাশেদের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। রাশেদ ইয়ানূরকে দু'হাত জড়িয়ে টেনে তুলল। এবং চেয়ার টেনে বসতে দিল।

: শান্ত হও ইয়ানূর, আমার দিকে তাকাও। তুমি মনে করো না যে, একা তুমিই কষ্ট পাচ্ছো। আমিও তো কষ্ট পাচ্ছি। প্রিয়জনদের হারানোর বেদনায় রাতে ঘুমাতে পারি না। এটা তো নিজ চোখে এসে দেখলে।

: চলো এই কষ্টের আজই অবসান হোক। তুমি আমায় যেখানে বলবে সেখানে যাব, যা করতে বলবে তা-ই করব। তুমি আমায় ফিরিয়ে দিওনা রাশেদ ভাইয়া, আমাকে ফিরিয়ে দিও না!

: ইয়ানূর, আজ থেকে একশ' বছর আগে পার্বতী নামে একজন মেয়ে গভীর রাতে দেবদাসের পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল — তোমার পায়ের কাছে আমাকে একটু স্থান দাও দেবদা, একটু স্থান দাও। সে রাতে দেবদাস পার্বতীর কথার কোন গুরুত্ব দেয়নি। পরে অবশ্য জীবন দিয়ে প্রমাণ করল পার্বতী ছাড়া তার জীবন ছিল অচল।

: তুমি কি চাও একশ' বছর পর আবার সে ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটুক?

: না ইয়ানূর তা চাই না। এবং আমার বিশ্বাস তা ঘটবে না। মজার ব্যাপার কি দেখেছ? যে দু'জন যুবক আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, বয়সের সামান্য পার্থক্য থাকলেও আমরা কিন্তু সকলেই একই বাড়ির ছেলে এবং একই বংশোদ্ভুত।

: এতে অবাক হওয়ার কি আছে। হাবিল-কাবিল তো একই মায়ের সন্তান ছিল। একটি মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করে। এবং এটাই পৃথিবীর প্রথম হত্যা কাণ্ড।

: আমার বিশ্বাস তা ঘটবে না।

: ভাইয়া তুমি কি ফিরোজকে ভয় পাও?

: না, ফিরোজকে ভয় পাব কেন? সে এই গ্রামের উৎকৃষ্ট ছেলে। এক জলোচ্ছাসে আমার শুধু বাবা মারা গেছে আর ওর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই মারা গেছে। ফিরোজ আর আমি বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম বলেই বেঁচে গেছি। আজ আমি তাকে ভয় করব! ভয় পাবার কি আছে!

: সেই শৈশব থেকে যাকে আমি স্বামী বলে জেনেছি, অজান্তে যার পূজা করেছি, মনে মনে দেহমন সঁপে রেখেছি যার পদতলে, সে আমার স্বামী হবে না, স্বামী হবে অন্য কেউ? তার আগে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

www.pathagar.com

: তুমি তো তার আংটি পরেছো।

: আংটি পরেছি নিজেকে বাঁচানের জন্য। নতুবা তোমার চাচাতো ভাই আলমগীরের শিকারে পরিণত হতাম। আর যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, তুমি বেঁচে আছো, তাহলে সেটাকেও আমি ভয় করতাম না। সব প্রতিকূলতাকে পায়ে দলে আমি তোমার নামে বন্দনা করতাম। আমি লেখাপড়া করেছি কার জন্য? কেবল তোমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য, তোমার উপযুক্ত বউ হওয়ার জন্য। আমার এত কষ্টের কি কোন মূল্য নেই? আর একজন লোক আমাকে আংটি দিয়েছে বলেই সে আমার সব কিছুর মালিক হয়ে যাবে ! চল, আজই আমরা চলে যাই, সকলে ভাববে তুমি হাশেমের সাথে সাগরে গেছো।

ইয়ানূর উঠে এসে রাশেদের হাত ধরল।

: ইয়ানূর, একটা কথা শোনো। এই গ্রামের জন্য, নদীভাঙ্গা অগণিত মানুষের জন্য আমার অনেক কাজ। গ্রাম ছেড়ে পালানো মানে হেরে যাওয়া। আর যেই আলমগীরের বিরুদ্ধে তোমার এর বিষোদগার তাকে তো অপকর্ম থেকে ফিরানো দরকার। আলমগীর তোমার কিছু না হোক, আমার তো ভাই, একই বাড়ির ছেলে। তাকে বোঝাতে হবে সৎ থেকেও বড় লোক হওয়া যায়। আমি যদি চলেই যাই তবে তার কি হবে?

: ভাইয়া, আমার ভয় হয়।

: কিসের ভয়?

: আলমগীর গভীর জলের মাছ। সে তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ঠেকাবে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার সাধ্য তোমার হবে না। এখানেই শুধু ভয়।

: দেখা যাক। আমি আলমগীরের দৌড় দেখতে চাই। তবে একটা কথা জেনো — সব ধ্বনির যেমন একটা প্রতিধ্বনি আছে, সব অপকর্মেরও একটা শেষ পরিণতি আছে।

: ভাইয়া, তুমি আমাকে বলে দাও আমি কি করব।

: কার ভাগ্যে কি আছে কেউ তো বলতে পারে না। ভাগ্যের কথা কেবল বিধাতাই ভাল জানেন।

: ভাইয়া, তুমি দর্শনের ছাত্র ছিলে জানি, দর্শন বাদ দিয়ে কি কথা বলতে পার না?

: ইয়ানূর, ঘটনাকে ঘটনার মত ঘটতে দাও। আর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় বটে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে দেয়া ঠিক না। তাতে দুঃখই বাড়ে।

: এবারও তুমি আগের মতই কথা বললে।

: অতীতে তুমি আমার বন্ধু ছিলে, আর আজ তুমি অন্যের বাগদত্তা, দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

: ভাইয়া, আমি আংটি খুলে ফেলেছি। যা একবার খুলেছি তা আর কোন দিন পরব না। তুমি যদি বিয়ে না কর আমিও করব না। আর কোনদিন বিয়ের কথা ভাবলে আমাকেই তোমার ঘরে তুলতে হবে।

: ছেলে মানুষী রাখো, তুমি এখন উচ্চ শিক্ষিতা। তোমাকে বুঝে শুনে কথা বলতে হবে।

www.pathagar.com

: ভাইয়া, সকলের কাছে শিক্ষার বড়াই চলে না। জানি আমি শিক্ষিত, শিক্ষিত বলেই তো আপন পর ভালমন্দ বুঝতে শিখেছি। তোমার কাছে আমার কিসের ব্যক্তিত্ব? আমি তো তোমারই। তোমার পায়ের কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দাও।

: ইয়ানূর, আমরা সামাজিক প্রাণী। সমাজকে বাদ দিয়ে আমার কিছুই করার উপায় নেই। সমাজের কথা রাখতে গিয়ে রাজা রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন।

: সীতাকে ত্যাগ করলেও সীতা তো তাকে ত্যাগ করেনি। সে স্বামীর বন্দনা করতে করতে জীবন বির্সজন দিয়েছে।

: তোমার স্বামী তো ফিরোজ। আমি তোমার প্রেমিক মাত্র। সমাজের চোখে এটাই সত্য।

: তোমার কথা ঠিক নয়। যাকে কখনো মন প্রাণ সঁপে দেয়া যায় না সে কখনোই স্বামী হতে পারে না। সেই অর্থে তুমিই আমার স্বামী। তুমি যা আমাকে হুকুম কর, তা-ই আমি করতে পারি।

: যদি হুকুম করি তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও, তুমি কি যাবে?

: অবশ্যই যাব। তবে কথাটা বলবে স্বামীর অধিকার নিয়ে, বন্ধু হিসেবে নয়।

: মানুষের সকল স্বপ্নসাধ পুরণ হয় না। আমাকে দেখো, একদিন অতি মেধাবী ছাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলাম। ভাবতাম কত বড় আমি হব, কত কাজ আমি করব! আমার জীবনটা হবে ছকে বাঁধা এবং সোনা দিয়ে মোড়ানো। অথচ বাস্তবে ঘটেছে তার পুরো উল্টোটা।

: ভাইয়া যত কথাই তুমি বলো না কেন, যত যুক্তিই তুমি দেখাও, আমি এসবের উত্তর দিতে পারব না। তবে একটি কথা আমি বলি — একবার যখন হাতের নাগালে তোমাকে পেয়েছি এক মহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে কোলছাড়া করব না।

: তুমি যাই বলনা কেন, সমাজের লোকরা বাঁকা চোখে না তাকলেও এক্ষেত্রে ফিরোজ একটি বড় বাঁধা। এই বাঁধা অপসারণের সাধ্য আমার নেই। যে সমাজে আমার পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন আমি কখনো সেই সমাজ ত্যাগ করতে পারব না।

: গ্রীক ট্রাজেডীর নায়করা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল একা হেলেনকে উদ্ধার করার জন্য। তাতে ট্রয় নাগরী ধ্বংস হয়, তুমি হয়ত তা করবে না।

: ইয়ানূর ফিরোজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সে একটি ভাল ছেলে। এই গ্রামে তার মত সৎ ও নিরীহ ছেলে দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া সে আমার চাচাতো ভাই। আমি কখনোই তার মনঃকষ্টের কারণ হতে পারবো না।

: কষ্টের কারণ হলে আমিই হব, তুমি হবে কেন? ভাইয়া মেয়েদের তোমরা প্রতারক বলবে, ছলনাময়ী, রহস্যময়ী বলবে — এসব বলার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু মেয়েরা খুব দুর্বল। লতাগাছ যেমন একটি শক্ত অবলম্বনের উপর ডালপালা বিস্তার করে, তেমনি মেয়েরাও অন্যের উপর নির্ভর করে বেড়ে উঠে। অন্যের উপর ভরসা করে বাঁচতে গেলে তো অভিনয় কিছু দেখাতেই হয়। তাদের বক্তব্য সোজা না হয়ে একটু বাঁকা — একেই তোমরা বল রহস্য।

www.pathagar.com

: সময় পাল্টে গেছে। মেয়েরা এখন নিজের পায়েই দাঁড়াচ্ছে। বাঁচার জন্য অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করছে না।

: মেয়েদের মধ্যে যারা নিজেদের বেশি স্বাবলম্বী বলে প্রচার করছে তারাই বেশি অন্যের উপর নির্ভরশীল। যারা নিরক্ষর শ্রমিক স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে তারাই মনে হয় অধিক স্বাবলম্বী।

: ইউরোপ আমেরিকাতে এখন লক্ষ লক্ষ মেয়েরা নিজেদের মত করে বেঁচে থাকে। নিজের জীবন-যাপনের জন্য অন্যের পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা করে না।

: একারণেই ইউরোপ, আমেরিকার সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। মানুষ পশু নয়। পরিবারকে কেন্দ্র করেই মানুষ বড় হয়। যেখানে পরিবারের বন্ধন নেই, মায়া মততা নেই, সেখানকার জীবন বেলেল্লাপনায় ভরা। আমাদের দেশে মানুষের যত দারিদ্র্যই থাকুক না কেন কেউ পরিবারের বন্ধনের বাইরে যেতে চায় না। ভাইয়া, আমি আংটি পরেছিলমা কেন, জানো?

: না বললে জানবো কিভাবে?

: তিন বছর ধরে তোমার কোন হদিস ছিল না। দ্বিতীয়ত বাবা মায়ের পুনঃ পুনঃ চাপ, সর্বশেষ আলমগীরের থাবা থেকে প্রাণ বাঁচানো। তুমি জানো না ভাইয়া একজন মেয়ে কত অসহায়। কোনভাবে একবার যদি সতিত্ব নষ্ট হয়, তবে এই সমাজে তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকেনা। শুধু নিজেকে বাঁচানো জন্য আমি ফিরোজের.....

: ইয়ানূর আমি তোমার কাছ থেকে কোন কৈফিয়ত তলব করিনি। তুমি এত কথা বলছো কেন?

: তুমি কৈফিয়ত চাওনি বটে কিন্তু আমার নিজের কারণেই কিছু কথা বলতে হয়। দিনের বেলায় সুযোগ হয় না বলেই রাতে এসেছি সকলের চোখ এড়িয়ে। তাতে যদি মন একটু হালকা হয়, মনের মধ্যে যে অপরাধবোধ কাজ করছে, যদি সেখান থেকে একটু রেহাই পাই!

: অপরাধতো করনি। পাপ না করে নিজেকে পাপী ভাবা অন্যায়। তুমি যা করেছো পরিস্থিতির চাপে পড়ে করেছো। আমি হলেও হয়ত তা-ই করতাম।

: ভাইয়া, তোমার কাছে শুধু এই কথাটিই শুনতে এসেছি। আমি যে অপরাধী নই - তোমার কাছ থেকে এর স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। আমি সেটা পেয়েছি। এই জীবনে আমার আর কোন দুঃখ নেই।

ইয়ানূর চট করে রাশেদের পা ছুঁয়ে সামাল করল। রাশেদ বাধা দিল না। কেউ স্বেচ্ছায় সম্মান দেখাতে চাইলে কখনই তাকে বারণ করা ঠিক না। মুখে শুধু বলল — আল্লাহ তোমার সাধনাকে জয়যুক্ত করুন!

ইয়ানূর বলল — ভাইয়া, তুমি কি জান আগুন কিন্তু নিজে জ্বলে না, তেল-গ্যাস-কিংবা লাকড়ীই তাকে জ্বলতে সাহায্য করে। আমার জ্বালানীর উৎস তুমি। তুমি যেভাবে চাইবে অনাগত দিনে আমি সেভাবেই জ্বলবো। যদি কখনো আমায় ফেলে দূরে সরে যাও, আমি তোমাকে তিন বছর খুঁজব তারপর জীবন বিসর্জন দিব।

www.pathagar.com

: ইয়ানূর, তোমার কথা শুনে আমার খুব ভয় লাগছে। সমাজের বাঁধা ডিঙ্গিয়ে আমি বিজয়ী হতে পারব তো?

: পারবে না কেন, অবশ্যই পারবে। রাজা ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ড প্রেমের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন।

: আমি অত বড় কিছু নই। অতি নগন্য একজন মানুষ। নদীর অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে সামান্য কূলের নাগাল পেলাম, কোন ভুলের জন্য যদি আবার এই কূল থেকেও বিতাড়িত হই, তাহলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? খোদার এই বিশাল দুনিয়ায় আমার যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইও নেই।

: তুমি কোন অন্যায় করনি, অপরের অধিকার ছিনিয়ে খাওনি, মানুষকে কষ্ট দাওনি — বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করবেন।

: তাই যেন হয়।

কিছুক্ষণ নিরবতার পর ইয়ানূর বললঃ ভাইয়া, আমি তোমাকে একটি জিনিস উপহার দিতে এসেছি। তোমার অনুমতি পেলে দিতে পারি।

: কী?

: একটি ফুলের মালা — বলেই ইয়ানূর আঁচলের গিট থেকে মালা বের করলো।

: তুমি ফুল পেলে কোথায়?

: দেখছো না এগুলি সব বনফুল? সিনেমার নায়িকা হলে আমি তোমাকে গোলাপের মালা দিতে পারতাম! কিন্তু সারা উজান অঞ্চলের কোথাও যে গোলাপ গাছ নেই। আমি কি করব!

: ঠিক আছে, যা এনেছো তাই দাও। আমি একে গোলাপের মালা বলেই গ্রহণ করলাম।

ইয়ানূর মালা পরাতে গিয়ে চট করে একটি চুমো খেলো। রাশেদ এতেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। শুধু বললো —

: তুমি একবার সময় করে সদরে যাও। ফিরোজকে তোমার মনের অবস্থাটা খুলে বল। আমার মনে হয় একমাত্র সে-ই পারে এর সুষ্ঠু সমাধান দিতে। সে যদি তোমার উপর থেকে দাবী প্রত্যাহার না করে সেক্ষেত্রে আমার কিছুই করার থাকবে না। মনে রেখো বাস্তবতা বড়ই নির্মম।

: সেটা অমার উপর ছেড়ে দাও।

রাশেদ বলল — চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

দরজা খুলে বাইরে পা রাখেতেই মনে হল কে যেন ঘরের কাছে থেকে দৌড় দিয়ে অন্যদিকে পালিয়ে গেল। কে হতে পারে? মানুষ না অন্যকিছু? অন্ধকারে কিছুই বুঝা গেল না।

তারা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে ভেড়িবাঁধের কাছাকাছি এসে গেলো। এখানে দেখা গেল ছোট দাদার দোকানের আড়ালে দু'জন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাশেদ বলল — কে? কে ওখানে?

www.pathagar.com

লোকগুলো এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়ি দিল। ইয়ানূর বলল — আমার ভয় করছে ভাইয়া।

: দূর পাগলী ! রাতের বেলা কত চোর ছেঁচোড় ঘুরে বেড়ায়।

: ভাইয়া, এরা চোর না।

: তাহলে কি ?

: আলমগীরের ভাড়াটে লোক। এরাই মানুষ খুন করে। ভাইয়া, আজ আমি তোমাকে এতরাতে ছাড়বো না। তুমি আমার কাছেই থাকবে। ভোরে জাগিয়ে দিব। সকালে উঠে তুমি হাশেমের নায়ে যেতে পারবে।

নয়.

একদিন একরাত পর এমন একস্থানে নৌকা এসে থামল যেখান থেকে চারদিকে কেবল পানি আর পানি। হাশেম বলল— এখানে আসতে আমাদের তিনদিন লেগে যাবার কথা কিন্তু উত্তরা বাতাস থাকায় পালে হাওয়া পেয়েছে ভাল। এজন্য অল্প সময়ে আমরা গন্তব্যে এসে পৌছলাম। রাশেদ বলল — গন্তব্য কোথায়। এ যে দেখছি অথৈ জল। চারদিকে গাছপালা তো দূরের কথা, কোন জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিমাই বলল— দাদা যে কি কন। কতক্ষণের মইধ্যে দেখবার পারবেন শীপ যাইতাছে। ইয়া মস্তবড় শীপ, একবার দেখলেই হাটফেল করবাইন। হাশেম বলল — এটা শীপের রুট না, রুট ছাড়িয়ে আমরা আরো দক্ষিণে এসে পড়েছি।

রাশেদ নদী বিধৌত এলাকার ছেলে। বলা যায় নদীর সাথে কথা বলতে বলতেই একদিন সে বড় হয়ে উঠেছে। আগেকালে গয়নায় নৌকা ছিল। গয়নার নৌকা মানে যাত্রীবাহী নৌকা। এই নৌকা ছাড়তো কচুখালীর যুগিরঘোল থেকে। খুব সকালে সিঙ্গায় ফু দিয়ে যাত্রীদের আহবান করা হতো। ঠিক সূর্য উঠার পূর্বক্ষণে সদরের উদ্দেশ্যে নাও ছেড়ে যেতো। কচুখালী পেরুলেই তেতুলিয়া নদী। সেই নদী পেরিয়ে সদরে পৌছতে সময় লাগতো। পরবর্তীতে লেংডিয়ার বিলের মধ্য দিয়ে রাস্তা হয়। ঘোষের হাট থেকে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। ক'বছর পরে ভেড়িবাঁধ নির্মিত হয়। এখন ইচ্ছে করলে তো ক'ঘন্টার মধ্যেই সদরে পৌছা যায়।

নদীর কোলে লালিত হয়েও রাশেদ কোনদিন নদীর বুক চিরে তালের নৌকা বায়নি, ডিঙ্গি নায়ের বৈঠা ধরেনি। ঘরের বগলে সমুদ্র অথচ সেই সমুদ্রে কোনদিন যাওয়া হয়নি। ছোট বেলায় সে দাদীর কাছে শুনেছে দক্ষিণে সাগর। সেখানে কেবল পানি আর পানি। তার দক্ষিণে আর কিছুই নেই। সাগরে এক জলদৈত্য থাকে। যে একহাতে লোকদের ডাকে, আরেক হাতে নিষেধ করে। বড় হয়ে সে জেনেছে এর সবই কাল্পনিক গল্প,সবই বানোয়াট। সাগরের দক্ষিণে মহাসাগর, তার দক্ষিণে কুমেরু। যদি কেউ অপর প্রান্ত দিয়ে ঘুরে আসতে পারে তাহলে সে রাশিয়ার সাইবেরিয়া পৌছে যাবে। যেমন আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশের পরেই প্রশান্ত মহাসাগর। সেটা অতিক্রম করতে পারলেই সহসা জাপানে চলে আসা যায়।

www.pathagar.com

পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। যেই কুমেরু সুমেরু সম্পর্কে মানুষের ভৌতিক ধারণা ছিল, এখন সেই অজেয় স্থানের আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হলেও মানুষ জানতে পারে। আগে যদি সমুদ্রে ঝড় উঠত, কিংবা ঘূর্ণিবার্তা তৈরি হয়ে লোকালয়ে আঘাত হানতো, মানুষ প্রকৃতির খেলা বলে একে মেনে নিত। এখন মানুষের হাতে রয়েছে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। মহাসাগরের কোন স্থানের পানি একটু নড়ে চড়ে উঠলেও মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জেনে ফেলে। এবং সেটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

হাশেমের নৌকায় আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি রেডিও ছাড়া আর কিছুই নেই। তাও আবার তিনটি ব্যাটারীর দু'টির অবস্থা শোচনীয়। হাশেম বলল— বর্ষা মওসুমে এর প্রয়োজন যত বেশি, এখন ততটা নেই। রাশেদ বলল — রেডিও থাকলেই কি আর না থাকলেই কি ! মনে কর আকাশের অবস্থা এখন খুব ভাল, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে সাইক্লোন উত্থিত হতে পারে ! রেডিওর মাধ্যমে জানা গেল যে বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতি দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে মুহূর্তে তোদের কী করার থাকবে ?

: এরকম ভয়াবহ বিপদে আমি আরো দু'বার পড়েছি। ছোটখাট বিপদ তো হিসাবের বাইরে। আসলে বিপদ এলে সকলের আগে যে কাজটা করা প্রয়োজন তাহল নিজের উপর আস্থা রাখা, কিছুতেই ঘাবড়ে না যাওয়া। এবং ধীরস্থির ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া।

: সামান্য ঝড়ে কীর্তনখোলা নদীতে একবার এক সাইক্লোনে বিশাল লঞ্চ ডুবে গেল আর তুই বলছিস সতর্ক থাকলে এখানে ছোট নৌকা ডুববেনা ? আমার বিশ্বাস, অনেক সময় দক্ষ মাঝির পক্ষেও কিছুই করার থাকে না।

: সেটা অবশ্য সত্য। তবে অভিজ্ঞ মাঝি হলে সে কিছুতেই হাল ছাড়ে না। ভয়ে যদি কেউ হাল ছেড়ে দেয়, তার মৃত্যু অনিবার্য। অবস্থা যদি একেবারেই সঙ্গীন হয় মাঝির পক্ষে বিপদ সামাল দেয়ার কোন উপায় না থাকে, তখন তিনি দ্রুত নাও খালাস করার হুকুম দেন। খুব দরকারী জিনিস ছাড়া সবই নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তাতেও যদি না হয় তিনি জাল কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর খালি নৌকা দশ/বারজন মাঝিমাল্লা নিয়ে ভাসতে থাকে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ একে নিয়ে খেলতে শুরু করে। ঢেউয়ের সাথে লাফিয়ে উপরের উঠে আবার ধপাস করে নিচে পড়ে যায়। যেদিক থেকে তুফান আসে তার বিপরীত দিকে মুখ করে মাঝি হাল ধরে রাখেন। তখন যত উঁচু হয়েই ঢেউ আসুক, তাতে সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি সাইক্লোন হয়, বা একটা কেন্দ্রের চারদিকে পানি প্রবল বেগে ঘুরপাক খেতে থাকে আর নৌকা ঐ কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। একবার কি হলো জানিস — তখন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি। সেবার মাছের খুব আকাল। সাগরেই একপন মাছের দাম তিন হাজার টাকা। টাকার লোভে মেঘনার মোহনা ছাড়িয়ে অনেক দক্ষিণে চলে গেলাম। এক বিকেলে উত্তর আকাশ কাল মেঘে ছেয়ে গেছে। হঠাৎ দক্ষিণের বাতাস বন্ধ হয়ে উত্তরের বাতাস শুরু হল। বাতাসের প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতেই আমাদের পাল ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল। দু'টো দাঁড়ই ভেঙ্গে গেল। আমরা তখন জোরেসোরে আল্লাকে ডাকতে শুরু করলাম। একজনে তিনবার আযান দিল। আমরা সমস্ত জালের মোটা রশি দুটি কেটে দিলাম। নৌকা বাতাসের ধাক্কায় দক্ষিণ দিকে যেতে থাকলো। রাত প্রায় বারটা পর্যন্ত একটানা ঝড় হল।

www.pathagar.com

সেই ঝড়ে মনে হল আমরা কয়েকশ' মাইল দক্ষিণে চলে গেলাম। ঝড়ের কবলে পড়ে সব হারিয়েছি সেজন্যে কোন দুঃখ নেই। প্রাণে বেঁচে গেছি সেটাই ছিল আমাদের পরম আনন্দ। আমাদের সমুদ্র উপকূলের একটি নতুন চরে পৌঁছতে আমাদের দশদিন লেগে গেল। এই দশ দিনে নৌকায় সংরক্ষিত সামান্য মাছ সিদ্ধ করে খাওয়া ব্যতীত খাবার মত আর কিছুই ছিল না।

রাশেদ বলল— ঠিক তোর এই মাছ ধরার কাহিনীর সাথে আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের লেখা একটি উপন্যাসের মিল আছে। সেই উপন্যাসের নায়ক সান্তিয়াগো নামের এক বৃদ্ধ প্রতিদিন সমুদ্রে বর্শি নিয়ে মাছ ধরতে যেতো। কিন্তু দিন যায়, রাত যায়, মাছ আর মিলে না। সে আরো গভীর সমুদ্রে গেল। অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার পর একটি মাছ পায় সে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য জানিস, সান্তিয়াগো বোটের সাথে বেঁধে নিয়ে কূলে ফিরতে ফিরতে হাঙ্গররা সমস্ত মাছটা খেয়ে ফেলে। হাশেম বলল — হাঙ্গর কুমির মাছ খায়নি বটে তবে প্রলংকরী ঝড় আমাদের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে। ঐ ঘটনার পর থেকে আমার অবস্থা শোচনীয়। তার আগ পর্যন্ত আমার নিজেরই জাল ছিল। ভাল বাদাম ছিল। জাল গুছাতে গিয়ে সুদের উপর অনেক টাকা দাদন নিলাম। আলমগীরও এই সুযোগে আমাকে কাবু করে ফেললো।

: ভয় নেই, আমি যখন এসেছি একটা ব্যবস্থা সে করবেই। যে যা বলে বলুক, আশা করি সে আমার কথা ফেলবে না।

: তোর কথা যেন সত্য হয়।

একদিন খুব ভোরে হাশেম মাঝি তার দলবল নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করল। সেই দিন গিয়ে রাত নামল। রাত গিয়ে আবার দিন হল। দিনের এখন প্রায় দুইটা বাজে। একটু আগে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের চাপ আসে দক্ষিণ দিক থেকে আর বাতাস হল উত্তরা। হালকা বাতাস। তবু কেমন উথাল পাথাল ঢেউ। তরঙ্গের চাপে এক একবার মনে হয় নৌকা দাঁড়িয়ে গেল। আবার ঢেউটা সম্মুখে অগ্রসর হলেই মনে হয় নৌকাটা আছড়ে পড়ল। রাশেদ বলল —

: সাগরে বাতাস নেই। তবুও নৌকা এভাবে লাফাচ্ছে কেন?

: লাফালাফির তুমি দেখেছো কি? এখন তো খুবই স্বাভাবিক অবস্থা। দক্ষিণা বাতাস হলে টের পাইতা। আসলে সমুদ্রের স্বভাবই হচ্ছে নড়াচড়া করা। তাতে বোঝা যায় সে জীবন্ত। তাছাড়া সমুদ্রবায়ু ও বৃষ্টির পানি এখান থেকেই উত্থিত হয়। সুতরাং সমুদ্র যদি নিশ্চুপ ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকে তাহলে এত কাজ হবে কিভাবে।

সাগরে জোয়ার এসেছে এটা বোঝার কোন উপায় নেই। যাদের অগাধ অর্থ তাদের যেমন কোন নিদিষ্ট ইনকাম চোখে পড়ে না। সমুদ্রের অবস্থাও সে রকম। এখানে অথৈ পানি। এই পানি বাড়ল বা কমল সেটা বোঝার সাধ্য কি! তাছাড়া বাড়ির কাছে খালে জোয়ার এলে যেমন খড়-কুটো ভেসে যায় এখানে খড়-কুটো বলে কিছুই নেই। কিংবা স্রোতও খরতর হয় না। এখানকার জোয়ার মানে পানির ফুলে উঠা আর ভাটি মানে পানি সামান্য কমে যাওয়া। কমা বাড়া এটা রাশেদের চোখে পড়ে না। হাশেমের মত দক্ষ মাঝিরাই কেবল বলতে পারে

www.pathagar.com

কখন পানি বাড়ল কখন কমল। কখন জাল ফেলতে হবে, আবার কখন টানা শুরু করতে হবে।

হাশেম যখন বলেছিল — আমরা গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি তখন ছিল বেলা সাড়ে নয়টা। রাশেদ তার অল্প কতক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছিল। হাশেম বলল — এখন জাল ফেলার দরকার নেই। তোমরা সকলে গোসল করে নাও। ভাত তরকারী বোধ হয় রান্না হয়ে গেছে। ভাত খেয়ে সকলে ছোট করে একটা ঘুম দিবে। ঠিক বারটার সময় জাল ফেলতে শুরু করবো।

রাশেদের উপর ছিল রান্না করার দায়িত্ব। কারণ রাশেদ সেই কথা বলেই নায়ে উঠেছিল। তার কারণেই একজন বয় আনা হয়নি। এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি। এখানে যে সাত/আটজন লোক প্রত্যেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করা আছে। কেউ অন্যেরটা করতে গেলেই তারটি আর করা হয় না। কাজের জট পাকিয়ে যায়। একজন বয় যে কেবল রান্না করে তা নয়। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল — মাস্তুলের সাথে পালের রশি লাগানো। পাল বাঁধার যে মোটা গাছ সেটাতে সব সময় একজন বয়স্ক লোক উঠতে পারে না। বিশেষ করে নৌকা যখন ঢেউয়ের তালে তালে লম্ফ-ঝম্ফ করে তখন একজন ভারী মানুষের মাস্তুলের উঠা মানেই নৌকা কাত হয়ে যাওয়া। তাতে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। সমুদ্র শান্ত থাকলেও দৈনিক দু'বার পাল খুলতে হয়। দু'বার লাগাতে হয়। আর সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলে তো যে কোন মুহূর্তে পাল নামিয়ে ফেলতে হয়। এজন্য সর্বক্ষণ একজন লোকের তৈরি থাকতে হয়।

তিনটি পাল। দু'পাশে দু'টি। মধ্যখানে একটি। তিনটি পালই মাস্তুলের সাথে বাঁধা থাকে। যদিও দু'পাশের পাল দু'টি প্রধান পালের সহযোগী মাত্র। সমুদ্রে আসার পর তিনটি পালই খুলে ফেলা হয়েছে। মধ্যখানের বড় পালটির পরিবর্তে একটি ছোট পাল লাগানো হয়েছে। তাও সেটা এখন মাস্তুলের গাছের সাথে পেঁছিয়ে রাখা হয়েছে। এখন বাদাম উড়িয়ে কোথাও যাতায়াত করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে জোয়ারের সময় যখন জাল ফেলা হয় তখন যেন নৌকা ধীরে ধীরে চলতে থাকে। আর সে সময় পাল তোলা থাকলে দাঁড়ীদের উপর চাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

হাশেম বলল — এখন দেখ একজন বয়ের কত দরকার। বয় থাকলে তাকে বৈঠা ধরিয়ে দিয়ে আমি এখন বিশ্রাম নিতে পারতাম। দু'দিন একটানা হাল ধরে আছি। আর কত সম্ভব !

: নিমাইকে দিলেই তো হয়।

: হয় বটে কিন্তু জাল ফেলার সময় দাঁড় চাপবে কে ! ওকে এখন ঘুমাতে না দিলে তো সময় মত কাজই করতে পারবে না।

: আমি দুঃখির ফ্রেণ্ড। তবে কিছু মনে না করলে আমাকে ধরতে দিতে পারিস। হাল ধরে চুপচাপ বসে থাকা এ আর কঠিন কি !

: হাল ধরে বসে থাকাটাই একটি নৌকার সবচেয়ে কঠিন কাজ। তোকে ধরতে দেয়া বা একবারে ছেড়ে দেয়া একই কথা। আর এখানে হাল ছেড়ে দিলে নৌকা ডুববে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

www.pathagar.com

নিমাই বলল — আমি একখান কথা কইতাম। যদি আপনে কিছু মনে না লন। রাশেদ বলল — তোমাদের যে কোন কথা আমাকে নিঃসংকোচে বলতে পার।

: আপনে আস্তে আস্তে দাঁড় চাপেন। আমি তাইলে ভাতও রান্দুম আর বৈঠাও ধরমু।

: তবে তা-ই হোক।

: হাশেম বলল — তা হয় না।

: কেন হয় না? হতেই হবে। আমি সমুদ্র দেখতে এসেছি। তার অর্থ এই নয় যে, আমি দুলামিয়া সেজে বসে থাকব।

: দুলামিয়া নয়, আসলে এখানে কাজ করার অভ্যাস থাকতে হয়। দাঁড় চাপলেই হাতে ঠোস ফুটবে। হাতে ঠোস ফুটলে কিন্তু আমাকে কিছু বলতে পারবে না।

: বলব না। কখনই বলবো না।

নৌকায় মলত্যাগ করার বিষয়টি যথেষ্ট পিকুলিয়ার। নৌকার একেবারে পিছনে যেখানে বৈঠা বাঁধা তার পাশ দিয়ে একটি বাঁশ বাঁধা আছে। এর চারপাশে কোন আড়াল নেই। পিছন দিক থেকে কারো দেখার সম্ভাবনা নেই বলেই আড়াল দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর কেউ ওখানে গিয়ে বসলেও উঁকি দিয়ে দেখবে না। রাশেদের প্রথম দিকে খুব লজ্জা লাগতো। মনে হতো — পিছনের কোন নৌকার যাত্রীরা যদি তাকে দেখে ফেলে! এখন এই ভয়টা কেটে গেছে। কারণ, যতই তারা লোকালয় ছেড়ে দক্ষিণে এসেছে ততই নৌকার সংখ্যা কমে গেছে। এখন তো সারা দিনেও একটি জলযান চোখে পড়ে না।

ভাত খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল নিমাই বৈঠা ধরে বসে আছে। এটা নদী বা খাল নয়। তাহলে কোন গাছের সাথে বেঁধে বা নোঙ্গর ফেলে বিশ্রাম করা যেতো। এখানে তো একশ' গজ পানি নয়, হাজার গজ বা তার চেয়ে অনেক বেশি। এখানে একশ' গজের নোঙ্গর ফেলা আর নিজেদের বোকা বানানো সমান কথা। রাশেদও তাদের সাথে ঘুমানোর চেষ্টা করলো কিন্তু কাজ হল না। কারণ, সে সকাল আটটা পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়েছে। নৌকাও তখন এতটা লম্ফ ঝম্ফ করেনি। একে তো উত্তরা বাতাস, তার উপর ছিল ভাটা। তৃ-পালী নৌকাটি সাঁ সাঁ করে সমুদ্রের দিকে চলে এসেছে।

রাশেদ আবার উঠে বসল। সে দেখলো মধ্য আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। মেঘ খণ্ডকে মনে হচ্ছে একটি ছোট চিল। এখানে গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই অনুভূত হয় না। যদিও শীতের সময়ে বাতাস উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তবু এটা তো সত্য যে, বছরের নয় মাস সমুদ্র থেকে মৌওসুমী বায়ু উত্থিত হয়। মোগল বাদশাদের মত যেন রাজ্য হারানোর পরও মনোবল অটুট থাকে। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু বাতাস উত্থিত হয়। সে বাতাস যখন নিজ স্বাভাবিক গমন পথের দিকে ধাবিত হতে পারে না, তখন সে নিজের উপর দিয়েও উত্তরা বাতাস প্রবাহিত হতে দেয় না। বছরের দু'সময়ে বায়ুর দিক বদল নিয়ে দু'পক্ষে প্রবল যুদ্ধ-জেহাদ হয়। আশ্বিন কার্তিক মাসে উত্তরা শুকনো বায়ুর প্রাধান্য থাকলেও ফাল্গুন মাসে আবার উল্টো চাপ শুরু হয়। তখন উত্তরা হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। সে সময় আর উত্তরা বাতাসের করার কিছু থাকে না। তখন এই সমুদ্র বায়ুরই জয় হয়। আর প্রকৃতিও এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। চৈত্র বৈশাখে যখন

www.pathagar.com

পূর্ণোদ্যমে দামাল হাওয়া শুরু হয় তখন প্রতিটি পত্র-পল্লবে শিহরণ জাগে, তারা আনন্দে হাসতে শুরু করে।

আশ্বিন মাস গিয়ে এখন কার্তিক মাস। এর মধ্যে রাজা শাইল ধান কাটা হয়ে গেছে। কার্তিক শাইলের গায়ে রং ধরেছে। অন্যান্য ধানেরও শীষ বের হয়ে গেছে। রাশেদ যে জমিতে বাড়ি বানাচ্ছে সেটাতে ছিল রাজা শাইল। ধান কাটা হয়েছিল বলে রক্ষা। নতুবা বাড়ির কাজ শুরু করতে আরো ক'দিন অপেক্ষা করা লাগবো।

এ অঞ্চলে আশ্বিন মাসের শেষ নাগাত বৃষ্টি হয়। কার্তিক মাস থেকে বৃষ্টির পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে থামে না। কখনো আবার অগ্রাহায়ণ মাসেও বৃষ্টি হয়। এক অগ্রাহায়ণ মাসে এমন বৃষ্টি হল যে পাকাধান পর্যন্ত ডুবে গেল। কিষাণদের ধান কাটতে হল পানিতে ডুবে। এখনো উত্তরা বাতাস এক টানা বইতে শুরু করেনি। মাঝে মাঝেই উত্তর-দক্ষিণ প্রতিযোগিতা হয়। আর অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয় ঝড় জলোচ্ছ্বাস। সাইক্লোনের কথা তো একবোরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কূলকিনারাহীন এই অথৈ সমুদ্রে যদি হঠাৎ শুরু হয় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবার্তা তাহলে কেমন হবে? উথাল পাথাল তরঙ্গ সংকুল এই দরিয়ায় যদি নিভে যায় জীবন প্রদীপ, তাহলেই বা কি করার থাকবে?

সমুদ্রে যেমনি মাছ থাকে তেমনি থাকে হাঙ্গর কুমীর জাতীয় কত মানুষখেকো প্রাণী। ছোট একটি ছান্দি নৌকা, বিশাল এই সমুদ্রে নৌকাটিকে মনে হয় মাছির চোখ। সমগ্র নৌকা এবং তার আরোহীরা সমুদ্রের একটি অতিকায় প্রাণীর এক গ্রাস হতে পারে মাত্র। হযরত ইউনুস (আঃ) একবার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন মাছের পেটে থাকার পরও আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেটা কেবল একজন নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তার নিজে ক্ষেত্রে নয়। কারণ, পাপ পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন একজন রাশেদের পক্ষে এই বিপদ থেকে উৎরে যাওয়া কি সম্ভব? এরকম ভীষণ বিপদ থেকে রেহাই পাবার মত মহৎ কাজও সে এপর্যন্ত করেনি। তাছাড়া প্রকৃতির ওতো স্বাভাবিক একটা নিয়ম আছে। আপেল যেমন মাটিতে পড়ে, তেমনি সমুদ্রে পতিত কোন মানব শিশুকেও গভীর তলদেশ আকর্ষণ করে। একখানা তৃণখণ্ডের মত মানুষও নিজেকে ভাসিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। এক সময় মাটির আকর্ষণে সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোন সমুদ্র প্রাণী একে আহার বানিয়ে নিল। এতেই বা মন্দ কি, জীবনের সমস্ত দুঃখ জ্বালা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সব কিছুরই পরিসমাপ্তি হয় এখানে।

রাশেদ গলুই এর উপর বসেছিল। নিমাই বলল — দাদা, বইসা বইসা কি ভাবতাছেন? এইদিকে আহেন. আপনেরে নদীর দুই একটা খেল তামাশার কথা এই।

: খেল তামাশার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না।

: কি যে কন দাদা, বাড়িত্থন আইলেন দুই দিন, তার মইধ্যে আপনের মন খারাপ অইয়া গেল?

: না রে মন খারাপ হয় নাই।

www.pathagar.com

: বাড়িত কি আপনের লাইগ্যা কেউ চিন্তা করতাছে?

: চিন্তা করবে কে! তোদের তো বাপ-মা, বউ-বাচ্চা আছে, আমার তো কেউ নেই। আপনজন ছাড়া কেউ অন্যের কথা ভাবে না।

: দাদা, আমার ধারে আহেন, আপনেরে দুই একটা গাঙের কতা কই।

: তোর যা ইচ্ছা তা-ই বল। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কোন গান গাইতে পারিস?

: গানের কতা যখন উডাইলেন দাদা, তাইলে কাশেম চরের এক গায়েনের কতা কওয়া লাগে।

: আমি সাইদুর রহমান বয়াতীকে চিনি। ছোট বেলায় তার গান শুনেছি।

: আরে না দাদা, ঐ ব্যাটা তো মইরা গেছে। ঐ বয়াতীর ছেইলে অহন গান গায়। বাপের থেইকা ছেলের গান অনেক বালা। বাব্বাহ গলাই একখান! একবার হুনলে আবার হুনতে ইচ্ছা করে।

: দেশে ফিরে একবার গানের আসর দিব। দাদার কালের যে পুরনো ঐতিহ্য ছিল সবই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।

: দাদা তাইলে আপনের ঘর বান্দনের দিন ঐ বয়াতীকে আইতে কইবেন। আমরা গেরামের হক্কলে মিল্লা তার গান হুনমু—

উত্তরে আছে গো ভাইজান হিলাময় পর্বত

দক্ষিণে আছে গো ভাইজান বঙ্গপো সাগর

সেই সাগরে.....

হাশেম হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বলল — এই নিমাই, এখন থাম। রাতে যত পারিস গাইবি, এখন ঘুমাইতে দে।

কতক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর নিমাই আবার রাশেদকে কাছে ডাকল। বলল — আপনের মন খারাপ অইলে আমারও অয়। এদিকে আহেন আপনের লগে আরো দু'একখান কতা কই। রাশেদ এবার নিমাই এর কথায় কোন আগ্রহ দেখালো না। বলল —ওদের ঘুমের ব্যঘাত হচ্ছে। কথা শুনার অনেক সময় পাব। সবে তো সাগরে এলাম মাত্র।

এখন দুপুর বেলা। সূর্য খাড়া ভাবে কিরণ দিচ্ছে, অথচ এই রোদ গায়েই লাগে না। আজ সকাল পর্যন্ত মনে হয়েছিল উত্তরের বাতাস। আর উত্তরা হাওয়া না থাকলে এত অল্প সময়ে এখানে আসা যেতো না। এখন মনে হচ্ছে বাতাসটা উত্তরা না।। ঘন্টা দুই নিস্তব্ধ থাকার পর এখন আবার দক্ষিণের হাওয়া শুরু হয়েছে। দক্ষিণের হাওয়া মানেই বিপদ। হাওয়ার বেগ যত বাড়বে তরঙ্গ তত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তারপর আবার কখন নিম্নচাপ উচ্চচাপ শুরু হয় কে জানে!

বাংলাদেশে মানেই প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ একটি দেশ। সমুদ্রের একেবারে কোলের মধ্যে বিধায় ঝড় ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি বাদল লেগেই থাকে। বর্ষা আসে আসে করে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে যেমন শুরু হয় কাল বৈশাখীর তান্ডবলীলা তেমনি বর্ষা যায় যায় করেও শেষ মুহূর্তে দেখা দেয়

www.pathagar.com

দুর্যোগের ঘনঘটা। গেল বছর আশ্বিন মাসে মহাসাগরে এক নিম্নচাপ উত্থিত হল। এটি ছিল বাংলাদেশ সমুদ্রে উপকূল থেকে অন্তত সাত আট–হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে। নিম্নচাপের কারণে সারা দেশে তিন চারদিন ধরে বৃষ্টি হল। শেষে দেখতে দেখতে নিম্নচাপটি যখন মাত্র এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে চলে এলো, তখন উপকূলীয় জেলা ও চরসমূহের জন্য দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণা করা হল। অবশেষে একরাতে চট্টগ্রাম, বাঁশখালী, সন্দীপ, মনপুরা ও উরীর চরের উপর এমন আঘাত হানলো যে, মুহূর্তের মধ্যে সব লোপাট করে দিয়ে গেল। আর জলোচ্ছ্বাসের পানি এত উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল যে, বিশাল করই গাছের মাথায়ও মানুষের লাশ ঝুলে থাকতে দেখা গেছে। এখন তো বাড়ির পাশ দিয়ে ভেড়িবাঁধ । চরকলমীর লোকরা আত্মরক্ষার জন্য মাটি কেটে মুজিব কেল্লা বানিয়েছে, সাইক্লোন শেলটার নির্মিত হয়েছে। এক সময় এসবের কিছুই ছিল না। ঢালচরের মত চরকলমীর লোকরাও তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে খোদার শাস্তি বলেই মনে করতো। এখন নিম্নাঞ্চলের লোকরাও ধীরে ধীরে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। আর সকল পরিস্থিতিতে নিজেদের রক্ষা করার কৌশলগুলিও শিখে ফেলেছে। আজ থেকে বিশ বছর আগেও যদি চরকলমীতে মুজিবকেল্লা বা একটি সাইক্লোন শেলটার থাকতো তাহলে তার বাবার মত অগণিত মানুষ কি আর বানের তোড়ে ভেসে যেতো?

দুপুর দু'ইটার দিকে সকলে জেগে উঠল এবং তার দশ মিনিটের মধ্যে জাল ফেলা শুরু হয়ে গেল। আশি গণ্ডা জাল নিয়ে হাশেম সাগরে এসেছে। এর মধ্যে চল্লিশগণ্ডা বড় জাল, বাকি অর্ধেক ছোট জাল। তার ইচ্ছে ছিল আশি গণ্ডা জালই লম্বা লওয়ার কিন্তু সামর্থের অধিক তো কিছু করা যায় না।

সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ। নদীর মত ঘোলা নয় বিধায় মাছরাও যথেষ্ট গভীরে বাস করে। আর গভীর পানির মাছ ধরার জন্য অবশ্যই বিশ গজী লম্বা জাল প্রয়োজন হয়। হাশেম এক সাথে সব জাল ছাড়লো না। আগে সমুদ্রের হাবভাব বুঝা দরকার। এজন্য সে দুই ধরনের জাল থেকে অর্ধেক করে সমুদ্রে ছেড়ে দিল। জাল পানিতে ফেলার সাথে সাথে দুপ্রান্ত দু'দিকে যায়। এক প্রান্তে চাক্কি থাকে যা জালকে নিচের দিকে টেনে রাখে। আরেক প্রান্তে ফোলার থাকে যা বর্শির ছুমার মত জালকে ভাসিয়ে রাখে। আশি গণ্ডা জাল খুব বেশি নয়। সমুদ্রে আসতে হলে অবশ্যই দেড়শ গণ্ডা জাল নিয়ে আসা উচিত। যারা বড় বড় ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে আসে তারা এর চেয়েও বেশি জাল নিয়ে আসে। কায়দা করে মাত্র দুই তিনবার জাল টান দিলেই তাদের ট্রলার ভরে যায়।

তারা যন্ত্র চালিয়ে দ্রুত সেগুলো উপকূলে রেখে আবার চলে যায় সমুদ্রে। তাদের ধৃত মাছগুলিও দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা হয় সময় মত বাজারজাত করনের। বেশি চালান নিয়ে ব্যবসা করলে কত লাভ! পরিশ্রম করলেও পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়। হাশেম মাঝির একটি স্বপ্ন — বিধাতা যদি কখনো তার অবস্থার পরিবর্তন করেন তবে সে একটি ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকা কিনবে। কমপক্ষে দুইশ' গণ্ডা বড়জাল থাকবে। কারো কাছে এক টাকাও ঋণ থাকবে না। নিজের ইচ্ছে মত মাছ ধরবে। স্বাধীনভাবে অর্থ কামাবে। নিজের লাভ লোকসানের জন্য কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হবে না।

www.pathagar.com

মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে জাল ফেলা হয়ে গেল। নদীতে জাল ফেলতে চিন্তা ভাবনা করা লাগে। কারণ, সেখানে অসংখ্য মাঝি জাল ফেলে। এক জাল অন্য জালের উপর উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া নদী দিয়ে লঞ্চ বা কার্গো চলে, সেগুলোর গতিপথ বাদ দিয়ে জাল ফেলতে হয়। এখানে সে ধরনের কোন ঝামেলা নেই। এক দিক থেকে অপর দিকে জাল ফেলে দিলেই কেল্লা ফতে। তবে এখানেও যে একেবার সমস্যা নেই তা নয়। এখানে কর্কট মাছ নামে এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী থাকে যাদের মাথার উপর রাইফেলের ব্যাওনেটের মত করাত থাকে। যদি কোন ভাবে একটি কর্কম মাছ বা হাঙ্গর জালের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে জালের অবস্থা সারা। এ পর্যন্ত কখনো হাশেমের জালে কর্কট মাছ বা ঐ জাতীয় হিংস্র জলজ প্রাণী আটকেনি। তবে একই গ্রামের করিম মাঝির জালে গত বছর একবার আটকে ছিল। ঐ মাঝি আর জাল নিয়ে বাড়ি যেতে পারেনি। তার প্রায় আঠার গণ্ডা জাল কেটে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

জলে স্থলে সর্বত্রই ঝুঁকি আছে। জলে যেমন বাস করে হাঙ্গর কুমীর তেমনি স্থলে বাস করে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হায়না। এরা কখনোই মানুষের কল্যাণ চায় না। হাশেম প্রথম যৌবনে একবার গিয়েছিল সুন্দরবনে মৌয়াল হয়ে মধু সংগ্রহ করতে। চার সদস্যের একটি ছোট দল। তারা মাত্র তিনদিন থাকলো ঐ বনে। তিন দিনের দুই দিনই তারা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়ে গেল। একবার একটা চিতাবাঘ এমন ভাবে তাড়া করলো যে, যদি তারা দ্রুত একটা গাছে উঠে না যেতো তাহলে এই পৃথিবীর মুখ আর দেখা সম্ভব হতো না। এই পৃথিবীতে মানুষের বন্ধু কেবল মানুষই, অন্য কেউ নয়।

জাল ফেলার মাত্র একঘন্টা ব্যবধানে টানের হুকুম এলো। সহকারীরা সকলে অবাক হল। কারণ, এত তাড়াতাড়ি জাল টানার কথা নয়। নদীতে জাল ফেলে কমপক্ষে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। সমুদ্রেও দুই আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করা লাগে। প্রয়োজনে নৌকা ঘুরিয়ে জালের অন্য মাথায় চলে যেতে হয়।

বিসমিল্লা বলে যখন জাল ফেলা শুরু হয় তখন সকলের আগে জালের নিশানা ফেলা হয়। যেই নিশানাটা সর্বাবস্থায় পানিতে ভাসমান থাকে। দিনের বেলায় পতাকা উড়িয়ে দেয়া হলেও রাতের বেলা তার সাথে হারিকেন বেঁধে দেয়া হয়। যাতে খুব সহজে জালের সীমানা চোখে পড়ে। ঘন্টা খানেক আগে মাত্র অর্ধেক জাল ফেলা হয়েছে, সকলে ভেবেছিল হয়ত খানিকটা বিরতির পর বাঁকি জালও ফেলার হুকুম হবে। অথচ নির্দেশ এলো তার উল্টো। নিমাই বলল — দাদা, জাল কি এই দিক থেইকাই টানুম, নাকি নাও নিয়া জালের ঐ মাথায় যাইবেন? হাশেম বলল — ঐ মাথায় যাবার সময় নেই। তোরা এখনই টান শুরু কর।

তড়িঘড়ি করে জাল টানা শুরু হল। রাশেদ প্রথম দিকে কতক্ষণ গলুই এর উপর বসেছিল। যখন দেখা গেল জালে প্রচুর মাছ আটকে গেছে তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। জীবনের শুরু থেকে বলা যায় ইলিশ মাছের সাথে পরিচয়, অথচ সে কখনো মাছ ধরা দেখেনি। বর্শিতে রুই কাতল মাছ আটকালে সে সহসা মরে না। মাছ তটে তোলার পরও অনেক্ষণ লাফালাফি করে। অথচ ইলিশ মাছের প্রাণ আশ্চর্য রকমের ক্ষণস্থায়ী। এই মাছ জালে আটকানোর সাথে সাথে প্রাণ হারায়। রাশেদ অবাক হয়ে প্রতিটি মাছ দেখছে, অথচ একটি মাছও জীবিত নেই।

www.pathagar.com

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাশেম একজন দক্ষ মাঝি। অতীব কৃতিত্বের সাথে বৈঠা ধরা থেকে শুরু করে সমুদ্রের কখন কি গতি সেটা সে বুঝতে পারে অনায়াসে। দল বেঁধে যাবার সময় হঠাৎ এক চাক মাছ তার জালে আটকে গেল। এটা আর কেউ অনুমান না করলেও বৈঠাধারী হাশেম ঠিকই টের পেয়েছে এবং দ্রুত জাল টানার নির্দেশ দিয়েছে। ওদিকে সে নিমাইকে বলেছে নায়ের মাথায় ডাবল রঙিন কাপড় উড়িয়ে দিতে। ডাবল রঙিন কাপড় মানেই হচ্ছে নায়ে মাছ আছে, যদি ভ্রাম্যমান কোন ট্রলার মাছ কিনতে চায় সে দ্রুত এদিকে চলে আসতে পারে।

যদিও জাল ফেলতে খুব একটা সময় লাগেনি কিন্তু জাল টানতে ও মাছ ছুঁটিয়ে নায়ে ভরতে বিকেল হয়ে গেল। প্রথম টানেই প্রচুর মাছ আটকেছে বিধায় মাঝি-মাল্লা সকলে খুব খুশি। সকলে রাশেদের ভাগ্যের প্রশংসা করল। কারণ, তার কারণেই মনে হয় আজ এক টানে তাদের চালান উঠে গেছে। এরকম যদি আরো পাঁচ সাত টান মাছ পাওয়া যায় তাহলে তাদের অবস্থা পোয়াবার।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এলো। অস্তাচলগামী সূর্য লাল কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীময়। সমুদ্রের পানিতে পড়ে সেই আভা এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছে। নববধূ যেমন চিরচেনা আবাল্য লালিত, মা বাবার অসীম স্নেহের বন্ধন কেটে অশ্রুসজল নয়নে নিজ বাড়ি ত্যাগ করে। তেমনি আজকের সূর্যটিও রঙিন চোখে কান্না বিধূর লোচনে মায়াময় এই ধরনী ত্যাগ করছে।

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য উদিত হচ্ছে আবার অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের এই উদয়নে অচলায়তনে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন যদি কারো চোখে কিছু ধরা পড়ে সে পড়েছে মানুষের নয়নে। সে কখনো সূর্যকে দেবতা বলে জেনেছে, কখনো শক্তির প্রতীক বলে তার কাছে মাথা নত করেছে, কখনো বা বন্ধু বলে তাকে কাছে ডেকেছে। আজ রাশেদের কাছে মনে হচ্ছে সূর্য হল নববধূ যার আগমনে সংসার আনন্দে উদ্বেলিত হয়, যার প্রস্থানে পৃথিবী থমকে যায়।

সূর্যের সাথে বোধ হয় প্রেমিক পুরুষের এক অকথিত প্রণয় আছে। সূর্য যখন অস্তাচলে হেলে যায় তখন প্রেমিকরা তাদের প্রণয়িনীদের নিয়ে হাজির হয় সমুদ্র সৈকতে। ডুবন্ত সূর্য তার রঙিন আভা ছড়িয়ে দেয় দয়িতার অবয়বে। আর দয়িতের অন্তরে জাগে গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস। দ্বিগুন স্বোৎসাহে সে মনের মানুষকে আরো কাছে পেতে চায়।

সমুদ্রে মনে হয় মেয়েরা আসে না। তারা যতই সম অধিকারের কথা বলুক, তারা মুলত নিজেদের কখনো এত চ্যালেজের মোকাবেলায় দাঁড় করাতে প্রস্তুত নয়। সমুদ্রে কত নৌকা কত ট্রলার। হাজার বছর ধরে পুরুষেরা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে অসাধ্যকে সাধন করছে কিন্তু মেয়েরা কখনো বাড়ির কাছের ছোট নদীতেও মাছ ধরতে যায়নি। অকথিতভাবে তারা কঠিন কাজগুলোকে পুরুষের ঘাঁড়ে চাপিয়ে নিজেরা ঘরের কোণে চুপটি মেরে থেকেছে। কিন্তু ইয়ানূরকে রাশেদ সে রকম ঘরকুনো বানাবে না। ইয়ানূর যদি সকল বাঁধা অতিক্রম করে তার বউ হয়েই আসে তাহলে প্রতিটি কাজে সে তাকে পাশে রাখবে। এমনকি আবার কখনো সুযোগ হলে সে ইয়ানূরকে সমুদ্রে নিয়ে আসবে। সে তাকে দেখাবে যে সমুদ্র সৈকতের

www.pathagar.com

সূর্যোদয় সূর্যাস্তের চেয়েও এখানকার সূর্যোদয় সূর্যাস্ত অন্য রকম। এখান থেকে মনে হয় এই ধরনীর স্থল বলে কিছু নেই। অথৈ জলরাশির মধ্যে থেকে সূর্য হাসিমুখে উদিত হয়, আবার ক্রন্দনরতা নববধূর মত এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তে উত্তর দিক দিয়ে গুম গুম শব্দ তুলে কি যেন একটা চলে যাচ্ছে। রাশেদ শব্দকারী বিশাল জলযানটিকে একবার দেখতে চেয়েছিল কিন্তু হালকা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে শব্দ ভেসে এলেও তার আলো এসে রাশেদের চোখে পড়ছে না। হাশেম বলল — আমরা মোহনা ছেড়ে খুব একটা দক্ষিণে আসিনি। শীপের যে নির্দিষ্ট রুট আছে, আমরা তার খুব কাছাকাছি। আমি অনেকবারই মাছ ধরার জন্য আরো দক্ষিণে গমন করেছি। তবে সেটা কেবল পৌষ-মাঘ মাসেই সম্ভব। কারণ তখন সমুদ্র একেবারে শান্ত থাকে।

সে রাতে আর জাল ফেলা হয়নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাছে পেয়ে যাবার কারণে অতিরিক্ত মাছ না ধরে তারা ধৃত মাছগুলো বিক্রির চিন্তা করলো। এজন্য সে মাস্তুলের সাথে হ্যারিকেন বেঁধে দিল। যাতে কোন ভ্রাম্যমান ট্রলার তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় এদিকে চলে আসে।

সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ বটে কিন্তু লবণাক্ত। আর পানির ঘনত্ব এত বেশি যে সহজে কিছু ডুবে যাবার সম্ভাবনা নেই। অথচ এখানে ভাসমান তেমন কোন বস্তুই চোখে পড়ে না। কলম্বাস যখন সমুদ্র পাড়ি দেন তখন অসীম সাহসই ছিল তার একমাত্র সম্বল। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অনেক দিন কেটে যাবার পর সহচররা তাকে ফিরে যাবার জন্য উৎপীড়ন করতে লাগলো। কারণ, তারা বুঝতে পারলো যে, যেই রসদ জাহাজে আছে সেটা ফুরিয়ে গেলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। তিনি ভাবছিলেন ফিরবেন কিনা ঠিক সে সময়ে কালো পানির মধ্যে একখণ্ড কচুরীপানা ভাসতে দেখলেন। সেটা দেখেই তিনি তার সাথীদের বললেন — লোকালয় খুব কাছে। এই তৃণখণ্ডই তার প্রমাণ। আমরা শীঘ্রই কোন ভূখণ্ডে পৌঁছে যাব। কোথায় সেই কলম্বাস, সিন্দাবাদ নাবিক আর কোথায় অসহায় ভীরু বাঙালী ছেলে রাশেদ। সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কোন অজানা রাজ্য অধিকার বহু দূরের কথা, এখান থেকে মাত্র আট দশ ঘন্টা পাল তুলে নৌকা চালালেই কোন না কোন স্থল ভাগের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাছাড়া এখন শীতকাল। সমুদ্র যারপরনাই শান্ত। তবু কখনো কখনো অজানা ভয়ে তার হৃদকম্প শুরু হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় হঠাৎ সমুদ্রে যদি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়!

দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। প্রথমদিন ছাড়া এই তিনদিনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটেনি। প্রতিদিনই সকাল বিকাল দু'বার জাল ফেলা হচ্ছে। বিকেলে জাল ফেললে রাত দশটার আগে টানার প্রয়োজন হয় না। এতক্ষণ রাখার পরও দশটা বিশটার বেশি মাছ জালে আটকাচ্ছে না। প্রথমদিন যে মাছ পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো পরদিন সকালে কোথা থেকে যেন একটি ট্রলার এসে অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কিনে নিয়ে গেছে। হাশেম ভেবেছিল এত মাছ দিয়ে কি হবে! তাছাড়া যদি বিকেল পর্যন্ত অনেক মাছ মারা পড়ে তাহলে এত মাছ সে রাখবে কোথায়! এখন তার মনে হচ্ছে ইলিশ যেখানে এত দুষ্প্রাপ্য সেক্ষেত্রে আরেকটু অপেক্ষা করলেই ভাল হতো। পরে তো আরো দুটি ট্রলার এসে মাছ খুঁজে গেছে। বাজার যাচাই করে বিক্রয় করলেই নিশ্চয়ই এত ঠগ হতো না।

www.pathagar.com

রাশেদের হাতে অফুরন্ত সময়। এতটা সময় পাওয়া যাবে জানলে সে দু একটা বই নিয়ে আসতো। বই কিংবা প্রেমিকা ব্যতীত কোন মানুষেরই দূরে কোথাও গমন করা উচিত নয়।

গত দু'দিন আকাশের অবস্থা ছিল সমুদ্রের পানির মতই স্বচ্ছ। আজ সকাল থেকে কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছে। দুপুরের দিকে মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছিল। বিকেলের দিকে পশ্চিমাকাশে আবার পর্বতের মত মেঘ জমে গেছে। পর্বতের যেমন থোকাও উঁচু কোথাও নিচু, তেমনি মেঘগুলিও উঁচু নিচু হয়ে আছে। আকাশে মেঘ জমলেও সমুদ্র অনেকাংশে শান্ত। দক্ষিণা হাওয়া বইছে বটে কিন্তু তার গতি যথেষ্ট ধীরস্থির। শীতকাল প্রায় এসে পড়েছে। এমুহূর্তে দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হবার কথা নয়। তবু কোন অলৌকিক কারণে এমনটা হচ্ছে কে জানে! সময় যতই যাচ্ছে রাশেদের মন ততই অস্থির হয়ে উঠছে। রাশেদের প্রচুর ধৈর্য আছে। ছোট বেলা থেকেই সে ভাবাবেগে তাড়িত হওয়ার চেয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে এগুনোর চেষ্টা করেছিল। তবু সে কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। বরঞ্চ অহেতুক চাঁদাবাজীর দায়ে তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান তিনটি বছর অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। একটি ছোট ভুলের জন্য আজ তার জীবন অন্য পথে পরিচালিত। পরিপাটি করে জীবন শুরু করার সকল সম্ভাবনা আজ তিরোহিত। তার সম্মুখে একটি অন্ধকার ভবিষ্যৎ। অনাগত দিনে সে কি করবে কিছুই তার জানা নেই। রাশেদ জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। এর মধ্যেই সে একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছে। হাতের নাগালে যা আছে তা দিয়েই জোড়াতালি দিয়ে সে তার যাত্রা শুরু করতে চায়। আদৌ সে কি পারবে ভবদরিয়া পাড়ি দিতে?

ইয়ানুরের কথা আজ কেন যেন তার বারবার মনে হচ্ছে। মনে হয় মেয়েটি ভাল নেই। সাগরে আসার রাতে ইয়ানূর তার বাড়িতে এসেছিল। সেই অন্ধকার নিশীথে একটি মেয়ে তার কাছে এসেছে। মেয়েটির যদি সর্বস্ব লুট হয়ে যেতো তার কিছুই করার থাকতো না। যে মেয়েটি কেবল তাকে বন্দনা করেই বেড়ে উঠেছে, তাকে সে ফিরিয়ে দেয় কিভাবে! হোক সে আরেকজনের বাগদত্তা। ফিরোজ যদি তার আংটি ফিরিয়ে নিতে রাজি হয় তাহলে তো সব ঝামেলা চুকেই গেল। কিন্তু যদি হিসাবে কোথাও ভুল হয়? ফিরোজ বাঁধ সাধে? কিংবা আলমগীর যদি এই সুযোগটাকে হাতে নিয়ে কোন রাজনৈতিক খেল খেলে? আলমগীর মহা ধুরন্ধর একটি ছেলে। সে অতি অল্প বয়সে মানুষের রক্ত চুষে কত টাকা জমিয়ে ফেলেছে! চাওয়া মাত্র আলমগীর তাকে অবলীলায় বিশ হাজার টাকা দিয়েছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। আলমগীরের চাল বুঝা এত কি সহজ! হোক সে বাড়ির ছেলে। চিলের স্বভাব যদি হয় ছোঁ মারা, সে তো ছোঁ মারবেই। তাতে মানুষের বাচ্চা উঠুক বা ইঁদুরের বাচ্চা উঠুক, কাউকেই সে রেহাই দিবে না।

ইয়ানূরকে যখন রাশেদ তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল তখন অচেনা তিনজন লোকের উপস্থিতি ছিল সন্দেহজনক। একজন ঘরের কাছে অন্য দু'জন দোকানের কাছে ছিল। তাদের কাউকে চেনাও গেল না। রাশেদের মনে হচ্ছে বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে। নতুবা তার মন এতটা অস্থির হয়ে উঠবে কেন? হাশেমকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে — এবার বাড়ি চল, তুই মাছ ধরে যা পেতিস্ সেটা আমিই তোকে দিয়ে দিব। এখন ফিরে চল। অথবা আমাকে

www.pathagar.com

পৌঁছে দিয়ে আয় উপকূলের কাছাকাছি কোন এক স্থানে যেখান থেকে আমি খুব সহজে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারব। কথাগুলো বলা যাচ্ছে না। কারণ, হাশেম তাকে জোর করে সমুদ্রে আনে নি। সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে। এসে আরো হাশেমকে নানান যন্ত্রণায় ফেলেছে। এমহূর্তে তাকে বাড়ি ফিরে যাবার অনুরোধ করাটা অন্যায়। ভয়াবহ অন্যায়। সে তো ছবি দেখে সময় কাটাতে আসেনি যে,ছবি না দেখলেও তার কিছুই যায় আসে না। বরং সে এসেছে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে প্রাণ হাতে নিয়ে অথৈ সমুদ্রে। মাছ মেরেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে, নতুবা দাদন ওয়ালারা তার আস্ত রাখবে না।

চতুর্থ দিনেও তেমন কোন মাছ পাওয়া গেল না। মাছ যদি পাওয়া যেতো তাহলে এখানে আরো অনেক জেলে-নৌকা বা ট্রলার দেখা যেতো। শীত এলে পানির কলকল খলখলও কমে যায়। নদীর পানির পরিমানও তখন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ফলে মাছরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সমুদ্রে চলে আসে। মাছদের সমুদ্রে ফিরে আসার সময় এখনো পুরোপুরি হয়নি। তারা যে আহারের সন্ধানে নদীতে বা উপকূলের কাছাকাছি গেছে, সেখান থেকে ফিরতে এখনো তাদের এক মাস সময় লাগবে। এক মাস পর যদি আবার তারা জাল নিয়ে আসে তাহলে হয়ত সাফিসিয়েন্ট মাছ পাওয়া যাবে।

চতুর্থ দিনের দিন হাশেম বলল — চলো আমরা মেঘনা বা তেতুলিয়ার মোহনায় চলে যাই। এক স্থানে একই উদ্দেশ্যে বসে থাকলে চলে না। ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য অবস্থানেরও পরিবর্তন করতে হয়।

মাছরা যদি প্রয়োজন পরিমান খাদ্য সমুদ্রে পেতো তাহলে তারা কখনই লোকালয়ের কাছকাছি যেতো না। কারণ, সমুদ্রই হচ্ছে মাছদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। এক সময় সকল স্থল প্রাণীরাই গভীর অরণ্যে বাস করতো। যখন মানুষ প্রথম সভ্যতার দিশা পেলো তখন কিছু প্রাণী মানুষের সঙ্গে অরণ্য ছেড়ে লোকালয়ে চলে এলো। তারা বুঝতে পারলো — মানুষের আদর-স্নেহ ছাড়া তাদের জীবন অর্থহীন। তেমনি কিছু মাছও তাদের হিংস্রতা পরিহার করে মানুষের হাতের নাগালে চলে এলো। ইলিশ তাদের অন্যতম। বিনয়ী মাছ হিসেবে ইলিশের খ্যাতি সর্বজন বিদিত।

পরদিন হাশেমরা মেঘনার মোহনায় চলে এলো। এখানে এসে দেখা গেল মোহনায় জেলে নৌকা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিছুক্ষণ পর পর একটা দুইটা নৌকা বা ট্রলার চোখে পড়ে। রাশেদ বলল — এখানে মাছ কম পাওয়াও ভাল। আশেপাশে লোকজন আছে। বিপদাপদে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

মোহনায় স্রোত বেশি। জোয়ার এলে মনে হয় নৌকা অনেক দূর উপরে উঠে গেল। আবার ভাটার সময়ও মনে হয় আমরা অনেক দূর নিচে নেমে গেলাম। সমুদ্রে যেমন কোন একদিকে জাল ফেললেই হলো। নদীতে জাল ফেলার সিসটেম ভিন্ন। এখানে জাল ফেলা হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।

এখানে মাছ পাওয়া যাচ্ছে। পর্যাপ্ত না হলেও আশানুরূপ। সকালের টানে হয়ত কম পাওয়া গেল। বিকেলের টানে সেটা আবার পুষে যায়। সমুদ্রের পানি যতটা স্বচ্ছ, এখানকার

www.pathagar.com

পানি ততটা নয়। এখানের পানিতে ময়লা আবর্জনা আছে। মাঝে মাঝে একদলা কচুড়ি পানাকেও ভেসে যেতে দেখা যায়। হঠাৎ হঠাৎ দু'একটা গাঙচিলও চোখে পড়ে।

মোহনায় থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। এখানকার পানি ঘুরপাক খায়, উথাল পাথাল ঢেউ উঠে। অনেক সময় হাল ধরাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শীতকাল এসেছে বলেই এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। বর্ষা মওসুমে যে কোন মুহূর্তে নাও উল্টে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কারণ, এখানকার স্রোত নানামুখী। বাতাসেরও কোন তাল ঠিক নেই।

এ কয়দিনে ইলিশ মাছের প্রতি রাশেদের একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। ইলিশ এত সুস্বাদু মাছ অথচ এখন ইলিশ রান্না হলেই তার আর ভাত মুখে দিতে ইচ্ছে করেনা। ইলিশ জালে কেবলই যে ইলিশ পাওয়া যায় তা নয়। কখনো পোয়া বা চিতল মাছও জালে আটকে যায়। যে বেলা অন্যমাছ রান্না হয় সে বেলা সকলের মনেই আনন্দ। সকলে তৃপ্তি সহকারে ভাত খেতে পারে।

দেখতে দেখতে এখানেও চারদিন কেটে গেল। এই চারদিনে যে মাছ পাওয়া গেছে তার বিক্রয় মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় দশহাজার টাকা। হাশেমের ইচ্ছা — যতদিন রসদ আছে ততদিন তারা এখানে থাকে। কারণ, যে হারে মাছ পাওয়া যাচ্ছে, এভাবে পাওয়া গেলে বড়লোক হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। সুযোগ বারবার আসে না। এই সুযোগটিকে সে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায়। বুঝাই যাচ্ছে মাছ ধরা এক নেশা এবং মাঝি–মাল্লা সবাইকে সে নেশায় পেয়ে বসেছে। ব্যতিক্রম কেবল রাশেদ। তার মন চাইছে উড়ে যেতে। তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে জেল খানায়। রাজনৈতিক নেতাদের জেলে গেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে। চোর ডাকাত গেলে সাহস বাড়ে। অলসরা গেলে মেদ বাড়ে। তার কিছুই বাড়েনি। বরং তার মেধা মনন ও কর্মস্পৃহা সবকিছুরই অবনতি ঘটেছে। অনেক দিন পরে সে গ্রামে এসে পুনরায় জীবন শুরু করতে চেয়েছে। কর্ম তৎপরতার এই সময়ে সমুদ্রে আসাটাকে তার এখন জেলখানার মত মনে হয়। মনে হচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। সে বাল্যকাল থেকে একে একে সবাইকে হারিয়েছে। সব কিছু হারিয়ে সে এখন শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই জীবনে সে আর কিছু হারাতে চায় না। হাতের কাছে সে যদি এক টুকরা খড়–কুটাও পায় তাকে আপন জেনে বুকের মধ্যে আকঁড়ে ধরে রাখতে চায়। সেই লেংডিয়ার বিল, ভেড়ির পাড়ের বাজার, চরকলমি গ্রাম সবাই যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ষষ্ঠ দিনে খুব পরিষ্কার আকাশে সূর্য উদিত হয়েছিল। কিন্তু বেলা যতই বাড়তে থাকল আকাশের অবস্থা ততই বিরূপ হতে লাগলো। অপ্রত্যাশিত ভাবে বাতাসের মোড়ও ঘুরে গেল। বেলা দশটা নাগাত তুমুল বেগে বাতাস শুরু হয়ে গেল। মোহনায় তরঙ্গের প্রচণ্ডতাও বেড়ে গেছে। প্রথম দিকে সমুদ্রে যাবার পর ঢেউয়ের অবস্থা যেমন বেগতিক ছিল, এখনকার অবস্থা আরো ভয়ংকর। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, ঢেউটা ফসকে গেলেই নৌকাটা ধপাস করে শূন্য থেকে আছড়ে পড়ে। তখন মনে হয় চারদিকের উঁচু ঢেউয়ের মাঝে নৌকাটি হারিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে আরেকটা উঁচু ঢেউ এসে নাওকে যেন শূন্যে তুলে ধরে। ঢেউ গেলেই সেটি শূন্য থেকে আবার নিচে পড়ে যায়। মনে হচ্ছে ছোট এ নৌকাটি যেন সমুদ্রের হাতের পুতুল। সে যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ে খেলছে।

www.pathagar.com

ব্যাটারী দুর্বল হওয়াতে রেডিওর আওয়াজ খুব ক্ষীণ। রাশেদের এখন দায়িত্ব হচ্ছে রেডিওতে কোন সিগনাল দেয়া হচ্ছে কিনা সেটা দেখা। এমুহূর্তে হাশেমের চেয়ে রাশেদের গুরুত্বই বেশি। কারণ, সংকেতের কথা ঠিকমত বলতে না পারলে নৌকার অবস্থা সঙ্গীন।

ভোররাতের দিকে যে জাল ফেলা হয়েছিল সেটা সকাল সাতটার মধ্যেই তুলে ফেলা হয়েছে। মাস্তুলের সাথে ছোট পাল টানানো ছিল সেটাও খুলে ফেলা হয়েছে। হাশেম হাল ধরে দক্ষ মাঝির মত গম্ভীর হয়ে বসে আছে। দাঁড়ী–মাল্লারা রেডিওর আশপাশে জড় হয়ে বসে আছে। রেডিওতে কোন সংকেত নেই। বরং 'ঢেউ দিও না জলে ও প্রাণ সজনী.....' এগান হচ্ছে। গান থামতেই টুন টুন দিয়ে এগারটার সংবাদ শুরু করে দিল। সংবাদ শেষে শুধু বলা হল — চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দর থেকে দু' হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সমুদ্রের সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে ইত্যাদি। রাশেদ সংবাদের ঢং দেখে অবাক হল। তার মনে হচ্ছে সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রলয় বয়ে যাচ্ছে অথচ শীতাতপ ঘরে বসে আমাদের সাবধানে চলার সংকেত জানানো হচ্ছে। গবেট কোথাকার ! যারা জীবনে একবারও সাগরে যায়নি তারা সাগর সম্পর্কে জানে কি ? সব অকর্মার ঢেঁকি ! নিমাই বলল — ছোড বাদামখান টানাই দেই, কি কন দাদা ? আমাগ কিনারের দিকে যাওন দরকার। অবস্থা ভাল ঠেকতাছে না। হাশেম বলল — তুই কাছি ধরে বসে থাকতে পারবি ? যদি হঠাৎ বাতাসের চাপ আসে, অমনি কাছি ছেড়ে দিবি। নিমাই বলল— পারমু পারমু। কি কনগো, পারমু না ? এই রহম কত কাছি ধইরলাম, কত ছাইরলাম, হাশেম বলল — ঠিক আছে তাহলে ছোট বাদাম খান টানিয়ে দে।

মাস্তুলের সাথে পাল বাঁধার আগেই আকাশে গুড়ুম গুড়ুম ডাক দিয়ে হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে গেল। নিমাই দমলো না। সে এর মধ্যেই মাস্তুলের সাথে পাল বেঁধে দিয়ে শক্ত করে রশি টেনে ধরল। পাল ধরল খুব ঢিলে করে। যাতে খুব বেশি বাতাস না আটকাতে পারে বা জোরে তুফানের ঝাপটা এলে ছিঁড়ে না যায়। মিল মত পাল না ধরলে নৌকা উল্টে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ছোট নৌকার ছোট ছই। ছইয়ের দুপাশে রাতে ঘুমানোর সময় ছালার চট দু'টি নামিয়ে দেয়া হয়। অন্যথা সব সময় এগুলি গুটিয়ে রাখা হয়। এখন ছইয়ের মধ্যে ঢুকে ছালার চট দু'টি নামিয়ে দিতেই হাশেম আপত্তি করল। সে বলল চট তুলে দাও, বাতাস আটকানো যাবে না। রাশেদের খেয়াল আছে একবার ঢাকার যাবার পথে তাদের লঞ্চ তুফানের কবলে পড়ল। সে রাতেও লঞ্চের পাশের পর্দা তুলে দেয়ার নির্দেশ এলো। যাতে বাতাস এপ্রান্ত দিয়ে ঢুকে ওপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। খালাসীরা পর্দা তুলে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে সব ভিজে জবজবা হয়ে গেল। এতক্ষণ হাশেম ও নিমাই ভিজছিল। এখন সাবইকে ভিজতে হচ্ছে। রাশেদের এমনিতেই ঠাণ্ডা লাগে। এখনকার ঠাণ্ডা বাতাসে তার গা ঠক ঠক করে কাঁপছে। কিছু বলার উপায় নেই। মানুষের জীবন যখন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তখন একটি প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় — আমি বাঁচব তো ? সীমাহীন কষ্ট হয় হোক। সকল দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে যদি বেঁচে থাকা যায় তবেই এজীবন ধন্য।

নৌকা উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে উল্কা বেগে এগিয়ে চলছে। যেন রেস খেলার কোন সহিস প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্য তার ঘোড়াকে সামনে দিয়ে দাবড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

তুফানের চাপে পালের কিছু অংশ ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়ার পরিমান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাতাস মাঝে মাঝে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। তুফানের পরিমান যখনই একটু বাড়ে তখনই নিমাই পালের রশি একেবারে ছেড়ে দেয়। তখন পালটি বাতসের বিপরীত দিকে পতাকার মত পত পত করে উড়তে থাকে। আবার বাতাসের চাপ একটু কমলেই নিমাই আবার রশি টেনে ধরে।

কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একদিকে মেঘের তর্জন গর্জন তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি। এখনকার পরিস্থিত দেখে মনেই হয়না ভোরের আকাশ এত সুন্দর ছিল। চারদিকে জনমানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। সমুদ্র ছেড়ে মোহনায় আসার পর এদিক ওদিক দু'একটা নৌকা বা ট্রলার চলাচল করতে দেখা গেছে। একরাতে তো জাল ফেলতে ফেলতে আরেকটা নৌকার সাথে ধাক্কাও লেগেছিল। এখন কোন দিকে একটি নৌকার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় আবহাওয়া বেগতিক দেখে প্রত্যেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে।

হাশেমের নৌকা এখন যেদিকে যাচ্ছে এভাবে কোণাকুনি যেতে থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তারা ঢালচর কিংবা মনপুরায় পৌছে যাবে। এই দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে কোন স্থলের সন্ধান চাই। স্থলের সন্ধান পেলে সেখানে কিছুক্ষণ থাকা যাবে। কিংবা জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা থাকলে স্থলভাগ ছাপিয়ে তারা আরো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারবে।

রেডিওতে দুপুর একটা বাজার সংকেত দিল। রাশেদ এবং তিনচারজন্য দাঁড়ি-মাল্লা উৎকর্ণ হয়ে একটার সংবাদ শুনতে লাগলো। প্রথমেই বলল আবহওয়ার বিশেষ সংবাদ। সেখানে বলা হল — চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দু হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে একটি নিম্নচাপ উত্থিত হয়েছে। নিম্নচাপটি আরো ঘণীভূত হয়ে উত্তর দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিম্নচাপের গতিবেগ ঘন্টায় একশ' কিলোমিটার। সমুদ্রের সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে দ্রুত নিরাপর স্থানে চলে যেতে বলা হয়েছে। সমুদ্র বন্দর গুলোকে তিন নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। সংবাদ শেষ হতে না হতেই বাতাসের প্রবল ধাক্কায় পাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এবং অল্পের জন্য নৌকাটি ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেলো। হাশেম বলল — ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি.....। নিমাই তোরা দাঁড় চাপ। এই দুর্যোগের মধ্যে আর পাল টানানো যাবে না। রাশেদ তুই আজান দে। জোরে সোরে আজানা দে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রক্ষা কর। এই মহাবিপদে তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। হে দয়াময়.....

দশ.

তিনদিন পর হাশেম মাঝির নৌকা ভেড়ির পাড়ের বাজারে গিয়ে পৌছল। এখন বেলা এগারটা। চারদিকে ঝলমলে আলো। যেন রাশেদের শুভাগমন উপলক্ষে প্রকৃতি অপার আনন্দে হাসছে। উত্তর থেকে হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশের কোথাও এক রত্তি মেঘ পর্যন্ত নেই। আজকের চরকলমীর হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশ দেখে বুঝার উপায় নেই যে, বিগত

www.pathagar.com

তিনদিনে তারা কত বড় দুর্যোগ মোকাবেলা করে প্রাণে বেঁচে এসেছে। হাশেম, রাশেদ, নিমাই, মাঝি-মাল্লা প্রত্যেকের অন্তরেই আজ বিজয়ী বীরের আনন্দ।

বিগত তিনদিন তারা যে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং প্রতিটি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন তাদের মনে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল সেটা বললে বোধ হয় কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। ভূতের গল্প বলার জন্যও ভূতুড়ে পরিবেশ চাই। আলোকোজ্জ্বল বিশাল ড্রইংরুমে বসে ভূতের গল্প বললে যেমন হাসির উদ্রেক করে তেমনি তারা আজ মেঘনার মোহনায় আপতিত মহাপ্রলয়ের কথা বললেও সকলে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিবে।

একদিন বেলা দশটায় তারা দুর্যোগের কবলে পড়ল। সেদিন গিয়ে রাত নামল। রাতের এগারটায় মনে হল — তাদের নৌকাটি এখন স্থল ভাগের উপর দিয়ে যাচ্ছে। এটি হয়ত একটি ভাসান চর। অধিক তুফানের কারণে চরের উপর পানি উঠে গেছে। যদি তাদের ধারণা সত্য হয় তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে চরের কোন নিশানা তাদের চোখে পড়বে। ধারণা সঠিক না হলে তাদের নৌকা অন্ধকার অমানিষা ভেদ করে উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে এভাবেই এগুতে থাকবে। হঠাৎ নিমাই এর চোখে পড়ল একটি ঘর। তার অদূরে আরেকটি ঘর। নিমাই ইংগিত করতেই হাশেম সেদিকে নৌকা এগিয়ে নিল।

ভাসান চরের এ বাসা-বাড়ি গুলির গঠন পদ্ধতি আলাদা। ঘরগুলি হয় অপেক্ষাকৃত ছোট। চাটাই বিছিয়ে বিশ-বাইশ জন মানুষ জেলখানার মত কোনমতে ঘুমাতে পারলেই হল। ঘরগুলি কিন্তু উচ্চতায় পনর বিশ ফুট। চরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বাসা-বাড়ি গুলি জমির মালিক বা চাষীরা তৈরি করে। সারা বছর দু'একজন পাহারাদার বা গরু মহিষের রাখাল এখানে থাকে। ভাদ্র/আশ্বিন মাসে যখন চরের পানি নেমে যায় তখন চাষীরা এসে ধানের চাষ করে। পৌষ-মাঘ মাসে আবার যখন ধান কাটার সময় হয় তখনো কিষাণ-বদলারা এসে এখানে থাকে। এই ঘরগুলোর সবচেয়ে ভাল দিক হল — প্রায় দশ-বার ফুট উপরে পাটাতন। আর এই পাটাতনের উপরেই লোকজন থাকে। । ফরেষ্টাররা যেভাবে হীংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য লম্বা খুঁটির উপর মাচান তৈরি করে, তেমনি ভাসান চরের কিষাণরাও বন্যা জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য লম্বা খুঁটির উপর ঘর নির্মাণ করে। খড়ের চালাঘরগুলি অনেকটা টং দোকানের মত। ঘরগুলো এত মজবুত যে, সাধারণ ঝড় তুফানে তাদের কিছুই করতে পারে না। সমস্যা হয় হঠাৎ কোন মহাবিপদ সংকেতের আভাস এলে। তখন এখানে লালকাপড় উড়িয়ে দেয়া হয়। রাখাল কিষাণরা তখন গরু-মহিষদের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে রেখে নিজেরা দ্রুত ভাসান চর ত্যাগ করে কোন আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যায়।

এই চরের নাম কি কে জানে! হাশেমরা এখানে কখনো এসেছে বলে মনে হয় না। তারা একটি বাসার সাথে নৌকা ভিঁড়ালো। তাদের ধারণা ছিল ঘরে কোন লোক আছে। ডাকাডাকিতে কাজ না হওয়ায় তারা অন্ধকারে দরজা খুঁজে বের করলো। দেখা গেল দরজার সাথে তালা ঝুলছে। তারা কাছাকাছি আরেকটা বাসায় গেল। সেখানেও একই অবস্থা। মনে হয় সকলে মহাবিপদ সংকেতের কথা জেনে এই চর ত্যাগ করেছে। রাশেদ বলল — আর সম্ভব না। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাতে, উত্তাল সমুদ্রের মাঝে একটু আশ্রয়ই যখন মিলেছে, একে ত্যাগ

www.pathagar.com

করা কিছুতেই ঠিক হবে না। মরতে হয় এখানেই মরব। মাচান পর্যন্ত পানি পৌঁছতে এখানো তিন চার হাত বাঁকি। এরপর চালা আছে। অবশেযে নৌকা। সে নিমাইকে তালা ভাঙ্গার আদেশ দিল। নিমাই ব্যর্থ হওয়ায় নিজেই একটা কাঠ দিয় আঘাত করে তালা খুলে ফেলল।

যদিও দুপুরের আগ থেকে একটানা বৃষ্টি তবু তারা নৌকার মধ্যে চুলা–ম্যাচ–লাকড়ীকে এমনভাবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখেছিল যে, বৃষ্টি ছাড়লেই যেন রান্নার কাজ শুরু করা যায়। ঢেউয়ের বিপরীত দিকে নৌকা বেঁধে হাশেমসহ একে একে প্রত্যেকেই মাচার উপর উঠে গেল।

বাসার মধ্যে চুলা ও লাকড়ী ছিল। সেগুলো তারা না ধরে নিজেদের জিনিস গুলোই ব্যবহার করলো। ভয়ংকর বিপদে সামান্য আশ্রয় মিলেছে সেজন্যে খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া। নিজেদের সামান্য থাকা অবস্থায় এমন কাজ করা যাবে না যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। রতন ভাত বসিয়ে দিল। নৌকা থেকে মাছ এনে হাশেম মাছ কুটতে শুরু করল। তারা সকাল থেকে কিছু খায়নি। রাত এখন অনেক। উত্তাল তরঙ্গের সাথে ভয়ংকর যুদ্ধ করে এখন মনে হচ্ছে তারা এক সপ্তাহ ধরে কিছুই খায়নি।

পরদিন সকালে দেখা গেল তুফানের বেগ আরো বেড়েছে বটে কিন্তু সে অনুপাতে পানি বাড়েনি। । পানি বাড়লে এতক্ষণে ঘর তলিয়ে যাবার কথা ছিল, কার্যত তা হয়নি। ঢেউ এলে মাচায় পানি স্পর্শ করে বটে ঢেউ চলে গেলে পানি আবার দুই হাত নিচে নেমে যায়। সকালের একটা ভাল দিক এইঃ রাতে প্রবল বৃষ্টি ছিল, এখন তা নেই। আবছা অন্ধকার থাকতেই তারা আবার যাত্রা শুরু করল। রাশেদ রেডিওর যেকোন একটা ষ্টেশন ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। মনে হয় এখনো ষ্টেশন খোলেনি। ঢেউয়ের অনুকূলে নৌকা চলছে। ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে। সকাল সাতটার সংবাদে জানা গেল — চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে এক হাজার কিলোমিটর দক্ষিণে নিম্নচাপটি অবস্থান করছে। সমুদ্র বন্দরগুলোর জন্য আট নম্বর মহাবিপদ সংকেত। সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

দুপুর দুইটা নাগাত তারা একটি বিশাল স্থল ভাগের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হাশেম দেখেই চিনতে পারলো — এটা ঢালচর। এই চরও ছিল এক সময় ভাসান চর। আস্তে আস্তে স্থল ভাগ উঁচু হল। মানুষ গাছ পালা রোপন করল। লোক বাড়তে থাকলো। এখন এখানে ইউনিয়ন পরিষদ আছে। স্কুল আছে, তিন চারটা আশ্রয় কেন্দ্র আছে। এক সময় বোধ হয় এর কিছুই ছিল না। আজ থেকে পাঁচিশ বছর পূর্বে হাশেমের বাবাসহ গ্রামের ছয়–সাতজন লোক এসেছিল ঢালচরে মাছ ধরার জন্য। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ছোবলে তাদের প্রত্যেকেই মারা যায়। অথচ এখন এই চরে কত মানুষের বসবাস! হাশেম যতবার সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে প্রায় ততবারই সে ঢালচর এসেছে। এখানে দু'একদিন রেষ্ট নিয়ে আবার গন্তব্যে পাড়ি দিয়েছে। এবারও হয়ত দু'একদিন থাকা পড়বে।

ঢালচরের নিচু এলাকাগুলি এর মধ্যেই তলিয়ে গেছে। এক হাজার কিলোমিটার দূরে একটি নিম্নচাপ, তার প্রভাবে হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষের কত কষ্ট! এখানে যে ছোট বাজারটি আছে তার পাশে অসংখ্য জেলে নৌকা। হাশেম সেখানে নৌকা বেঁধে দলবল নিয়ে

www.pathagar.com

নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। পরদিন বিকেল পর্যন্ত জানা গেল নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে আজ ভারতের উরিষ্যা অতিক্রম করেছে।

হাশেম চরকলমী বাজারে গিয়ে দেখলো তিনটি ঘরের চালা নেই। দু'টি ঘর কাত হয়ে পড়ে আছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, গত পরশুর প্রবল ঝড়ে ঘরের চালা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সে মনে মনে আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে তার নতুন ঘর এখনো উঠানো হয়নি। কাঁচা মাটির উপর নতুন ঘর তোলা হলে সেটাকেও বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতো। রাশেদের ধারণা ছিল — নিশ্চয়ই এর মধ্যে ঘর ভিটা তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শেষ না হলেও বৃষ্টির পানি শুকালেই আবার কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখা গেল তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিগত দশ-বার দিনে এক ওঁড়া মাটিও ফেলা হয়নি। তার মনে হল — ছোট দাদা নিশ্চয়ই গাফলতি করেছেন। তার কাছে বিশ হাজার টাকা দেয়া ছিল। তিনি কোন কাজ করালেন না কেন? ছোট দাদার দোকানে গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না। রাশেদ ভাবলো — মাথা গরম করে লাভ কি! নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। যা হয়েছে তার মোকবিলা করার জন্য তাকে ধীরস্থির ভাবে কাজ করতে হবে। সে বাড়ি চলে গেল। তার এখন বিশ্রাম দরকার। একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দু'তিনদিন একটানা রেষ্ট নেয়া প্রয়োজন। ততদিনে এর হয়ত গুরু রহস্যটাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

যার কোন ঠাঁই নেই সে যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু জানে না সে প্রকৃত অবলম্বন তার হাতের কাছে নেই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) গুহায় বেড়ে উঠে প্রথম যখন লাল আলো বিচ্ছুরণকারী সূর্যকে দেখলেন, তখন বললেন — এ-ই আমার প্রভু। পরে সূর্য ডুবে গিয়ে যখন চাঁদ উঠলো, তখনো বললেন — এই আমার প্রভু। অবশেষে চাঁদও যখন ডুবে গেল তখন বললেন — এরা কেউই আমার প্রভু নয়। কারণ, তিনি কখনো আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারেন না। রাশেদও অতি কৈশর থেকে তার আপনজনদের হারিয়ে চলেছে। বাবা-মা, দাদা-দাদী কেউই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। যখনই কেউ একজন দাঁড়িয়েছে তখনই তার চিরপ্রস্থান ঘটেছে। দাদীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল সে একা একা ছিল। জেলখানার কষ্টের দিনগুলিতে সামান্য সমবেদনা জানাতেও কেউ যায়নি।

প্রত্যেক মানুষের কষ্ট করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। অতীব দুঃখী মানুষরাও মনে মনে একটি স্বপ্ন লালন করে, যার কথা ভেবে সে পুলকিত হয়। অনেক দিন বেঁচে থাকার আশা করে। রাশেদ জেলখানায় থেকেও অনকেদিন ইয়ানূরের কথা ভেবেছে। এক আধখানা চিঠি পাঠিয়ে নিজের কষ্টের কাহিনীও জানাতে চেয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে কিছুই জানানো সম্ভব হয়নি। তবু এত কাল পর ফিরে এসে দেখলো তার ময়না তারই পথ চেয়ে বসে আছে। এটা দেখে তার বাঁচার আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে গেল। সে প্রবল আনন্দ নিয়ে ধীরেসুস্থে কিছু কাজে হাত দিল। কিন্তু এত ত্বরিৎ গতিতে হাত ফিরে আসবে এটা সে ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি।

তিনদিন পর ছোট দাদার কাছ থেকে আসল সত্য জানা গেল। দাদা বললেন — তুমি চলে যাবার পর আমরা মাটিয়ালদের নিয়ে মাটি কাটতে যাব ঠিক সে মহূর্তে আলমগীরের

www.pathagar.com

লোকজন এসে বাঁধা দিল। সে বলল — চরকলমীতে রাশেদ বলে কেউ নেই। কোনদিন থাকবেও না। তার সহায় সম্পত্তি বলেও কিছু নেই ! দাদা আরো জানালেন —এর একদিন পর আলমগীর জোরপূর্বক টাকাগুলো নিয়ে গেল। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি একটি ভাল কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন এবং অসহায় রাশেদের জন্য কিছু করতে পারেন নি বলে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

ইয়ানূয়ের বাপ রফিক চাচা বললেন — তোমার চলে যাবার পর আলমগীর নিজে এসে হুমকি দেয় যে, যদি ইয়ানূর কালই সদরে চলে না যায় তাহলে পরের রাতে সে তার লোকজন দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। এমন কি তারা রাশেদকেও আশ্রয় দিতে পারবে না। যদি তা দেয় সেজন্য তাদের চরম মূল্য দিতে হবে ইত্যাদি।

রাশেদ রাস্তায় বেরুতে পারছে না। যারা বিগত ক'দিন তার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, তারা মনে হয় রাতারাতি তাকে পরিত্যাগ করেছে। লোকজন বলে বেড়াচ্ছে যে, রাশেদের সাথে ইয়ানূরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সে অন্যের বাগদত্তা বউ হয়েও রাতের অন্ধকারে রাশেদের কাছে যেতো এবং রাশেদও তার কাছে আসতো। রাশেদের বিরোধী পক্ষ এই রটনাকে একটা ধারালো ইস্যু হিসেবে ব্যবহার শুরু করল।

কেউ কেউ বলল — রাশেদকে তারা অতি ভাল ছেলে বলেই জানতো কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা নীচে নেমে গেছে — এটা তাদের ভাবতেই অবাক লাগছে। তৃতীয় দিন বিকেল পর্যন্ত তার তিন বছরের জেল খাটার কথাটা কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেল। সবাই বলল — রাশেদ যদি ভাল ছেলেই হবে তবে তো তার জেল খাটার কথা নয়। মূলতঃ তাকে যতটা সাধু মনে হয় সে তার চেয়েও ভণ্ড। মুখে একটা সরলতার ভাব ফুটিয়ে রাখলেও ভিতরে তার সাত প্যাঁচ।

সম্মান অর্জন করা খুব কঠিন কাজ। হারাতে এক মুহূর্তও লাগে না। রাশেদ ছোটবেলা থেকেই ছিল খুব মেধাবী ছাত্র। তার সততা ও আন্তরিকতা সকলকে আকৃষ্ট করতো। এমন কি চরকলমীর সবচেয়ে উঁচু বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ঘরের শত্রু বিভীষণের কারণে সে আজ লাঞ্ছিত পদদলিত। শতবর্ষের সম্মান কি কোন দিন ফিরে পাওয়া সম্ভব? সত্য একদিন উদঘাটিত হয় বটে কিন্তু ততোদিন পর্যন্ত টিকে থাকাই দুষ্কর। যেদিন চরকলমীর অধিবাসীরা জানতে পারবে রাশেদ নিরপরাধ তিতোদিন পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে তো? নেকলেস চুরির অপরাধে এক গৃহস্বামি চাকরানীর মৃত্যু দণ্ড দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর যখন দেখা গেল নেকলেসটি চুরি হয়নি। নেকলেসটিকে নিয়ে চুড়ুই পাখিরা ন্যায়দণ্ডের মধ্যে বাসা বানিয়েছে। তখন তার আর করার মত কিছুই নেই। পরে সকলে চাকরানীর সততার প্রশংসা করেছে বটে কিন্তু ততদিনে তো সবশেষ।

রাশেদ তার ছোট দাদা, ফুফু, হোসেন মৌলবী সহ গ্রামের গণ্যমান্য অনেকের কাছে গেল। । উদ্দেশ্য একটাই — এই হীন চক্রান্তকে কিভাবে প্রতিহত করা যায় তার জন্য একটি পরামর্শ চাওয়া। তার আফসোস হচ্ছে এজন্য যে, এদের কেউই তাকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারলো না।

www.pathagar.com

রাশেদ এখন কি করবে? পাঁচ ছয় দিন আগে সমুদ্রে যে ঝড় উঠেছিল সেখানেই তার মরে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে কখনই সে জানতে পারতো না —তার একটি ভয়াবহ প্রতিপক্ষ আছে, যারা খড়গকৃপাণ হাতে দিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এত শত্রু! এত দুর্নাম! শৈশব থেকে একজন মানুষের উপর এত বিপদ কেন? ঢেউয়ের পর ঢেউ, ঝড়ের পর ঝড় — এর মহাদুর্যোগের মধ্যে একজন অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ কোথায়? একজন মানুষের পরিণতি হয় যদি মৃত্যু তাহলে একজন দুর্বল মানুষকে নিয়ে বিধাতা এত নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠলেন কেন? রাশেদ তিনদিন ধরে একটু দানা পানি মুখে দেয়নি। কোন কাজ করতেও মন সায় দিচ্ছে না। লোকজনের সাথে কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। রাশেদ কি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ইয়ানূর চরকলমীতে নেই। যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে এ দুঃসময়ে রাশেদের পাশে এসে দাঁড়াতো। রাশেদ যেদিন সমুদ্রে গেল তার পরদিনই ইয়ানূরের সদরে যাবার কথা। সে যথা সময়ে গিয়েছে বটে কিন্তু অপবাদ রটে যাবার কারণে চরকমলীতে ফিরে আসার সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া তাকে চরকলমী ফিরতে হলে অবশ্যই ফিরোজের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়েই ফিরতে হবে। সে ছাড়পত্র ফিরোজ আদৌ তাকে দিবে কিনা সন্দেহ।

ভাল কিছুকে তো সকলেই নিজের কাছে রেখে দিতে চায়। বিধাতার দানকে কেউই হাতছাড়া করতে চায় না। ফিরোজ নিশ্চয়ই এতটা বেকুব নয়।

মানুষ কিজন্য বেঁচে থাকে? নিশ্চয়ই প্রত্যেকের এমন কিছু লক্ষ্য থাকে যা অর্জন করার জন্য সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। রাশেদের জীবনের কোন টার্গেট নেই। তার বেঁচে থাকার যেমনি নেই কোন অবলম্বন তেমনি নেই কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য। মানুষ সাধনা করে ফল লাভের আশায়, ধ্যান করে সিদ্ধি লাভের জন্য। রাশেদ কোনটা করবে? তার মাথার উপর পাহাড় পরিমাণ অপবাদ। তার উপর নেই কোন আপনজন। এমুহূর্তে একটু সান্ত্বনার প্রয়োজন। একটু খোঁজ খবর করা দরকার। এসব কাজ তাকে কে করে দিবে?

রাশেদ ঠিক করল আত্মহত্যা করবে। এত অপমান অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া মৃত্যু যখন প্রত্যেকের জন্য অবধারিত, তখন না হয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার মৃত্যু হল — তাতে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্য অকালে হারিয়ে গেছে। মাকে তো সে দেখতেই পায়নি। দাদা-দাদী, বাবা-মা প্রত্যেকেই যেন যার মত করে ইহধাম ত্যাগ করেছে। কেউ একটু ভাবেনি এই বংশের একটি অসহায় বালকের কী হবে?

সকলে যখন মরে বেঁচেছে তেমনি সেও মরবে! মরে প্রমাণ করবে এই পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতিই তার লোভ ছিল না। সত্যিই সে যদি লোভী হতো তবে অন্তত লোভনীয় বস্তুটি পাবার জন্য হলেও সে বেঁচে থাকতো।

রাশেদের আজ কেবলি মনে হচ্ছে — তার এই গ্রামে না ফিরাই উচিত ছিল। যদি তেতুলিয়া নদী পুরো গ্রামটা ভেঙ্গে নিয়ে যেতো তাহলেও একটা ভাল ছিল। কিংবা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে স্থায়ীভাবে ঢাকাতেইবা থেকে গেল না কেন! কোন উদ্দেশ্য, কিসের

www.pathagar.com

টানে গ্রামে ফিরে এলো? সে তো জানে গ্রামে তার আত্মীয়-স্বজন কেউ বেঁচে নেই। পৈতৃক ভিটে বাড়িও আছে কিনা সন্দেহ। তবু সে বাড়ীর টান উপেক্ষা করতে পারেনি।

জীবনে কোন মানুষ যা-ই করুক না কেন সেটা অন্তত নিজের জন্মস্থান জন্মভূমিকে ভুলে গিয়ে নয়। সে অনেক আশা করে,অনেক নদী সাঁতরে বাড়ি এসেছে এবং এখানে আসার পর তার মনে হয়েছিল কিছুই সে হারায় নি। সবই তার ঠিক আছে। অথচ মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে আজ তার মনে হচ্ছে মুক্তির সকল দরজাই আজ বন্ধ ।

আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে হতাশা মৃত্যুর দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রাশেদ এখন কোন দিকে যাচ্ছে?

তার সবচেয়ে বেশি দুঃখ হচ্ছে এজন্য যে, যেই আলমগীর তার বিরুদ্ধে এত কঠোর, তার জন্য মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে — সে তারই বংশের ছেলে এবং একই রক্তধারা উভয়ের শরীরে প্রবাহিত। ঘরের শত্রু বিভীষণ। বাইরের শত্রুকে কাবু করা যায়। ঘরের শত্রু ষড়যন্ত্র করলে ধ্বংস অনিবার্য।

এখনো রাশেদের আপন দুইজন মানুষ এ গ্রামে আছে। একজন ছোট দাদী দ্বিতীয় জন রফিক চাচা। রফিক চাচা একজন নদী ভাঙ্গা অসহায় মানুষ। যে কোন মুহূর্তে আলমগীরের লোকজন তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তাছাড়া তার মেয়েকে নিয়ে যেখানে স্কান্ডাল রটেছে সেক্ষেত্রে তিনি রাশেদকে সাহায্য করতে পারছেন না, এটাই স্বাভাবিক।

গ্রামে ফিরে আসার পর ছোট দাদী সব সময় তার খোঁজ খবর করতেন। সময় হলেই খাবার পৌঁছে দিতেন। সেই দাদী গত ক'দিনে একবারও রাশেদের ঘরে আসেননি। সে খেলো কি না খেলো তারও কোন খোঁজ খবর করেননি। হয়ত তিনি রাশেদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু আলমগীর তাকে ভয় দেখানোর কারণে তিনিও আসতে পারছেন না। হায় পৃথিবী, তুমি কত নির্দয় নির্মম!

রাশেদের কাছে এখন রাতদিন সমান। সমুদ্র থেকে ফিরে আসার পর সে প্রথম দু'দিন বাইরে বের হয়েছে। দু'চারজনের কাছে পরামর্শও চেয়েছে। এখন আর বাইরে বের হতে ইচ্ছে করে না। সে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকে। আগে দিন-রাত ঘরের জানালা গুলি খোলা থাকতো, এখন সব বন্ধ। মনে হচ্ছে এই ঘরটি একটি মৃৎপুরী। যারা এই ঘরে বাস করে তাদের প্রত্যেকের অকাল মৃত্যু হয়েছে। তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে সবচেয়ে কম বয়সে। মাত্র একটি সন্তানের জন্ম দিয়েই তিনি এই পৃথিবীর পাঠ চুকিয়ে দিলেন। মা দেখতে কেমন ছিলেন? দাদীর ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা রূপবতী রমনী। অথচ রাশেদ তাকে কোনদিন দেখেনি। দাদী-বাবা -দাদা সকলের কথাই তার কম বেশি মনে আছে। কেবল মা-ই তার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন।

সময় কখনো দুর্বিসহ, কখনো মধুময়। অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসে যে মায়ের রাত কাটে, তার জীবনে তো সকালের সূর্য এত সহজে উদিত হবার কথা নয়। রাশেদের মনে হয় সে এখন জেলখানায় আছে। কখনো কখনো মনে হয় তার চেয়েও ভয়ংকর অবস্থায় আছে।

www.pathagar.com

জেলাখানায় ফাঁসির আসামী ব্যতীত কেউ একা থাকে না। প্রতিটি সেলে অন্তত কয়েক শ' মানুষ থাকে। তাদের মধ্যে রাজা-উজির,দারোয়ান-কোতোয়াল সব থাকে। একজন ছিঁচকে চোরের অভিজ্ঞতার কথাও অন্যরা খুব আগ্রহ করে শোনে।

এছাড়া কয়েদীদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ কাম থাকে। ওখানে গেলেই প্রত্যেকে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ফলে জেলখানায় সময় কাটানো খুব একটা কষ্টের ব্যাপার নয়। রাশেদের মনে হচ্ছে এখন সে রাক্ষসপুরীতে আছে। জেলখানায় তো মানুষ থাকে। কারো মন খারাপ হলে অন্যরা এসে সান্ত্বনা দেয়। রাক্ষাসপুরীর অবস্থা ভিন্ন। রাক্ষসদের অনুভূতি আলাদা। তাদের পক্ষে কি মানুষের কষ্ট অনুভব করা সম্ভব? যদি তাই হতো তাহলে বিগত দিনে অন্তত একজন মানুষ এসে তার খোঁজ নিতো।

কতক্ষণ সে ঘরের এমাথা ওমাথা পায়কারী করে, কতক্ষণ শুয়ে থাকে, কতক্ষণ বই পড়ে, আবার কতক্ষণ বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবে। কিন্তু ভয়াবহ হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত কোন লোকের পক্ষে কি স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব?

এই পৃথিবীতে মানুষ কেবল তখনই মৃত্যুর কথা ভাবে যখন তার বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটিও নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। ক্ষুধা, অপমান, হতাশা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে সে একপা দুইপা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। রাশেদ ঠিক করল সে মরে যাবে। এমুহূর্তে মৃত্যু ছাড়া তার সম্মুখে আর কোন পথ খোলা নেই। জগতের কোথাও গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত জায়গাও নেই। খামখা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে বেঁচে থাকায় কি লাভ! পুরুষ যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রাশেদ সত্যই আজ পরাজিত। বাল্যবয়সে সে খুব ভাল ছাত্র ছিল। এস এস সির ফলাফলই তার বড় প্রামাণ। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য এত বড় স্কলার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে অনার্স কোর্সটাও শেষ করতে পারেনি। সে এক সময় অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সকল অধিকার হারিয়ে অপমান জনক ভাবে রাজনীতি ত্যাগ করে। একদিন সে ছিনতাই করার জন্য রাস্তায় বের হয়। প্রকৃত ছিনতাইকারী শটকে যেতে সক্ষম হলেও সে বেদি মাছের মত হাতেনাতে ধরা পড়ে। তার তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এক সময় তার আত্মীয় বন্ধু বান্ধুবের অভাব ছিল না। আজ এই দুঃসময়ে কেউ তার পাশে নেই। একদিন মানুষের প্রচুর কল্যাণ করার উদগ্র বাসনা ছিল তার অন্তরে, আজ সে নিজেই অন্যের করুণা প্রার্থী । চরকলমীর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সর্বাপেক্ষা ভাল ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আজ সে লাঞ্চিত অপমানিত পদদলিত। নিজের লোকদেরকেও সে আপন করে ধরে রাখতে পারেনি। নিজের সামান্য লোভ আর ভুলের জন্য তারা আজ ঘোরতর শত্রু। এ-সবের মাশুল দিতে গিয়ে আজ তাকে একমাত্র মৃত্যুর পথই বেছে নিতে হচ্ছে।

আগে কাঁটা বাগানে শিমুল গাছ ছিল, রাত দুপুরে মৃত্যুর জন্য ওখানে গেলেই যথেষ্ট হতো। ভূত প্রেত ছাড়াও ওখানে যে শিয়ালরা বাস করতো, একজন মানুষকে ছিঁড়েখুড়ে খেয়ে ফেলার জন্য তারাই যথেষ্ট ছিল। এখন সেখানে কাঁটা বাগানও নেই, শিমুল গাছও নেই।

www.pathagar.com

ওখানে এখন ভেড়িবাঁধ, যার উপর দিয়ে দৈনিক সহস্র লোক যাতায়াত করে। নদী যদিও ঘরের কাছে তবু নদীতে ডুবে মরা দুষ্কর। কারণ, রাশেদ সাঁতার জানে। একজন সাঁতার জানা মানুষের ডুব দিলেই ভাসতে ইচ্ছে করবে। ফলে আর মরা সম্ভব হবে না। মৃত্যুর জন্য এমন একটা পথ বেছে নিতে হবে, যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অঞ্চলে যদি রেল লাইন থাকতো তাহলে রাশেদ রাতের অন্ধকারে রেল লাইনের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকতো আর শেষ রাতের ট্রেন এসে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে রেখে যেতো। সারা ভাটি অঞ্চলে যখন ট্রেন লাইন নেই তখন বাধ্য হয়ে বিকল্প চিন্তা করতেই হয়। তার সামনে মৃত্যুর জন্য একটা পদ্ধতিই খোলা আছে, সেটা হল গলায় ফাঁসি দেয়া । একবার গলায় রশি লাগিয়ে ঝুলে গেলেই হল, সেখান থেকে ফিরে আসা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

রাশেদ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল যে, সে আজ রাতেই আত্মহত্যা করবে। ঘরের মধ্যে ফাঁসি লাগিয়ে ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করা ঠিক হবে না। দূরে কোথাও জঙ্গলঘেরা বাগানে যেতে হবে, যেখান থেকে খুঁজে এনে যেন কেউ তার পরাজিত মুখ দেখতে না পারে। মৃত্যুর পর ধরা পড়লেও ভয়। পুলিশ এসে নিয়ে যাবে লাশকাটা ঘরে। ডোমরা বুক ফেঁড়ে ছিঁড়ে রাখবে কলিজা-গুদ্দা। তার অভিশপ্ত লাশ আনার জন্য চরকলমী থেকে কেউই সদরে যাবে না। কোন মৌলবীও জানাজা পড়াতে রাজি হবে না। ফলে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর ডোমরা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে তাকে ফেলে আসবে মড়কখানায়। হাজারো বেওয়ারিশ লাশের সাথে তার দেহটাও একদিন পঁচে-গলে নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে।

এক গাইছ মোটা রশি হাতে রাশেদ ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লো। চারদিক নিঃসীম অন্ধকার। আকাশের কোথাও একটি তারাও নেই। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। মেঘে ঢেকে আছে সমস্ত আকাশ। সমস্ত প্রকৃতি যেন শোকে মুহ্যমান । রাশেদ কতটুকু গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালো। তার চোখ ফেটে কান্না আসছে। বুকের উপর দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। মহানবী যখন প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে মদীনা যান, তখনও তিনি বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিলেন। অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বলেছিলেন— 'হে প্রিয় মাতৃভূমি! তোর নিষ্ঠুর সন্তানরা আমাকে তোর কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে দিল না! হে মাতৃভূমি, আমি তোকে খুব ভালবাসি! খুবভাল — হে মাতৃভূমি!' রাশেদও আজ চিরদিনের জন্য তার ঘর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। এই ঘর, এই মাটি যেখানে যে অসংখ্যদিন গড়াগড়ি খেয়েছে। সেই আতাফল গাছ, বাঁশঝাড় যেখানে সে অগণিত দিন ইয়ানুরের সাথে কানামাছি খেলেছে। এই দেশ, এ সমাজ যার কাছে তার অনেক অঙ্গিকার ছিল। এই সংসার, এই পৃথিবী যার জন্য তার অনেক করণীয় ছিল — সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে সে আজ চলছে চিরদিনের মত।

আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো..
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে .....

কতদূর গিয়ে রাশেদ আবার ফিরে তাকালো। তার মনে পড়ছে পূর্ব পুরুষদের কথা, তার মা, দাদা দাদী সকলে এমন একস্থানে শায়িত ছিলেন, সেই স্থানটি এখন আর নেই। অনেক দিন আগে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই ঐতিহ্যবাহী মসজিদ সংলগ্ন করবস্থানটি থাকলে

www.pathagar.com

রাশেদ এখন সেখানে যেতে পারতো। পূর্বপুরুষদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসতো। এই জীবনে আর কোনদিন তাদের কবরের পাশে দিয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ হবে না। এই পথ, এই রাস্তা, এই গাছপালা আর কোনদিন দেখা হবে না। তাদের সুশীতল ছায়াতলে কোনদিন বসা হবে না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত দেখা যাবে না। কত ইচ্ছা ছিল মনের মানুষকে নিয়ে জ্যোৎস্না দেখে, একটি ডিঙ্গি নিয়ে নদী পাড়ি দেয়। নদীর চরে ঘুরে বেড়ায়। একজন আরেকজনের হাত ধরে দীগন্ত জোড়া আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে। এই জীবনে সেই সাধ আর পুরন হলো না।

রাশেদ ভেড়িবাঁধের উপর দিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো। সে এখান থেকে আহমদুল্লা মৌলবীদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে পূর্ব দিকে বিলের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন জঙ্গইল্লা ভিটা আছে। সে জলাভূমির মধ্য দিয়ে সোজা ওখানে চলে যাবে। সেখানে যে শিমুল গাছ, আম গাছ আছ, তার যে কোন একটার ডালে রশি লাগিয়ে ঝুলে পড়লেই হল।

ঠিক আহমদুল্লা মৌলবী সাহেবেদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত যেতেই তার মনে হল, পূর্ব দিকে দৈত্যের মত মহিলারূপী কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু দৈত্য বা রাক্ষসের যে বিশ্রী চেহারা ভীতিপ্রদ ভাবভঙ্গি এর অবস্থা সে রকম নয়। রাশেদের মনে হচ্ছে জঙ্গইল্লা ভিটাকে পশ্চাতে রেখে সাদা পোশাক পরে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার পা মাটিতে থাকলেও মাথা গগন স্পর্শী। তার মুখমণ্ডল দেখা যায় না। রাশেদ ভেড়িবাঁধের উপর দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে এ যেন দেবদূত। তার ধবধবে সাদা পোশাক থেকে এত উজ্জ্বল কিরণ বেরুচ্ছে যে, মনে হচ্ছে সমস্ত বিল আলোতে ঝলমল করছে। রাশেদ আর জঙ্গইল্লা ভিটার দিকে এগিয়ে যাবার সাহস পেলো না। সে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই আবার ফিরে চলল।

শৈশবে রাশেদ একবার জুলমত আলী নামের এক লোকের কাছে তার জীবনের কাহিনী শুনেছিল। অর্থাৎ সে গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু যে গাছের সাথে ফাঁস লাগাবে সে গাছের কাছে দেখা গেল সাদা কাপড় পরিহিত একজন অচেনা ব্যক্তি বিপরীত দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে সে আত্মহত্যা না করে ঘরে ফিরে এলো। আজও রাশেদ সেরকম এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলো। পার্থক্য শুধু এই যে, জুলমত আলি দেখেছিল একজন কামেল পুরুষকে নামাজ পড়তে আর সে দেখল গগনস্পর্শী শ্বেতশুভ্র এক রমনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এতক্ষণ পর তার বোধোদয় হল যে, সে একটি মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিল। মানুষের জীবনে মৃত্যু একবারই হয়। সে যদি মরেই গেল তাতে তার নিজেরও কোন লাভ হলো না। সমাজেরও কোন উপকার হলো না। পরন্তু মৃত্যুর আগে এমন একটা কাজ করে যাওয়া উচিত যাতে মানুষ শান্তি পায়, উঠতে বসতে তার নাম নেয়। এই চরকলমীর মানুষ এখনো তার দাদার নামে অন্ধ। তিনি সমাজের লোকদের নিয়ে পাকা মসজিদ বানিয়েছেন। গ্রামের ছেলে মেয়েদের উন্নতির জন্য স্কুল গড়েছেন। জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে চরের মানুষদের

www.pathagar.com

বাঁচানোর জন্য মাটির কেল্লা বানিয়েছেন। তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। আরো বেশি দিন বাঁচলে অনেক কাজই করে যেতে পারতেন। তার মৃত্যুর পর থেকে নাকি চরকলমীতে কোন আনন্দ উৎসব হয়নি। তিনি বেঁচে থাকতে বছরে অন্তত দু'একবার গানের আসর বসাতেন। দূর-দূরান্ত থেকে বয়াতী ও কবিআলদের ডেকে আনতেন। রাতের খাবারের পরে গান শুরু হতো। সারা রাত ধরে চলত জারি-সারি-মুর্শিদী-মারফতী ও নানান রূপ কথার গল্প। গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলে গান শুনতে আসতো। গান শেষ হলে আনন্দ কলরব করতে করতে বাড়ি ফিরতো। সেই স্মৃতি আজ ইতিহাস।

রাশেদ হাঁটতে হাঁটতে রফিক চাচার বাসার কাছাকাছি এসে গেল। তার ইচ্ছে হল রফিক চাচাকে ডেকে একটু কথা বলে। সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিটা স্পষ্ট জানা দরকার। তাছাড়া ইয়ানূর বলেছিল সে ফিরোজকে আংটি ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। সে এখনো এসেছে কিনা কিংবা ফিরোজ তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছে কিনা — এসব তার এক্ষুণি জানা প্রয়োজন। সে ডাকবে নাকি একবার? রাশেদ রফিক চাচার ঘরের পাশে এসে দাঁড়ালো। দরজায় সামান্য টোকা দিলেই তিনি অমনি জেগে উঠবেন। কিন্তু নিচে নামার পর তার আর ডাকতে ইচ্ছে হলো না।

রফিক চাচা তার আপন চাচা নয়। কোন প্রকার রক্তের সম্পর্ক আছে কিনা তাও তার জানা নেই। দাদীর দিকের আত্মীয় বলে তিনি একসময় পরিচয় দিতেন। কথাটা কতটুকু সত্য কে জানে! তবে তিনি একসময় বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি রাশেদের কাছ থেকে এক প্রকার দূরেই সরে গেছেন। যতটুকু সম্পর্ক রাখা দরকার সেটা কেবল তিনি তার মেয়ের কারণেই রেখেছেন। হোন না তিনি নদীভাঙ্গা মানুষ, না থাকুক তার শান-শওকত! রাশেদ যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন তিনি একটু খোঁজ খবর করতে পারতেন। ইচ্ছা থাকলে কিনা করা যায়!

তিনি চান তার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক। চাই সেটা রাশেদের সাথেই হোক আর ফিরোজের সাথেই হোক। তিনি মেয়ে নিয়ে বাড়তি কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না। এটা তার কথাবার্তা শুনলেই অনুমান করা যায়। আসলে রাশেদ ওতো চেয়েছিল ইয়ানূরের বিয়ে ফিরোজের সাথেই হোক। এজন্য আনুষ্ঠানিকতা যা করা লাগে তার নতুন বাড়িতেই সে করতে চেয়েছিল। এই চিন্তা মাথায় নিয়েই সে তার বাড়ির কাজ শুরু করে। কিন্তু যেদিন সে সমুদ্রে যায় সে রাতে ইয়ানূরের বাড়তি পদক্ষেপে বিপরীত দু'টি ঘটনা ঘটে গেল। রাশেদকে সে বুঝাতে সক্ষম হল যে, সে মূলত রাশেদের জন্যই বেড়ে উঠেছে। তার উপযুক্ত বউ হওয়ার জন্যই লেখাপড়া শিখেছে। সে এতদিন নিরুদ্দেশ থাকার কারণে অন্যের আংটি পরেছে। তাছাড়া বিয়ে তো হয়নি। মাত্র আংটি বিনিময় হয়েছে। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় এঙ্গেজমেন্ট হওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। কিংবা বিয়ে হওয়ার পরও ছেলে মেয়ে একজন আরেকজনকে মেনে নেয় না। সুতরাং ফিরোজ যদি অনুমতি দেয় সে রাশেদের কাছে ফিরে আসতে পারে। রাশেদও শেষ পর্যন্ত তার কথায় সম্মত হয়। কিন্তু আনন্দঘন এই ঘটনাটিই যে তার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে এটা কে জানতো! দুশমনরা একটি দুর্বল ঘটনাকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলো। রাশেদের কি সাধ্য তীর্যক বেগে ধেয়ে আসা ধারালো তীর থেকে নিজের জীবন রক্ষা করে!

www.pathagar.com

যে ভোরে রাশেদ হাশেমের সাথে সমুদ্রে গেছে সেদিন কিংবা তার পরদিন ইয়ানূরের সদরে যাবার কথা। যদি একদিনও সে চরকলমী থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই স্কাওালের কথাটা তার কানে গেছে। আবেগের গতি প্রতি সেকেণ্ডে একশ' ষাট কিলোমিটার আর স্কাওালের গতি হল হাজার কিলোমিটার। সুতরাং একথা সহজে অনুমান করা যায় যে, ইয়ানূরের ফিরার ইচ্ছা থাকলে এতদিনে চরকলমী এসে যেতো। এই দুঃসময়ে রাশেদের পাশে দাঁড়িয়ে সে সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দিত। তাছাড়া অল্প সময়ের মধ্যে যদি বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে উল্টো দুর্নাম রটনাকারীদের মুখেই চুনকালি পড়তো। ইয়ানূর উপস্থিত থাকলে ঘটনা হয়ত উল্টো দিকে মোড় নিত।

যেহেতু ইয়ানূর এতদিনে ফিরেনি। তার বিশ্বাস ইয়ানূরকে রফিক চাচা এমন কিছু বলে দিয়েছেন যার জন্য সে গ্রামে ফিরার সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সমুদ্রে থাকা কালে রাশেদ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হতো। দ্রুত ঘরে ফিরে আসার জন্য অবিনাশী টান অনুভব করতো। তার মনে হতো কিছুই সে হারায়নি। সবই তার হাতের কাছে আছে। অথচ অল্প ক'দিনের ব্যবধানে মনে হচ্ছে এই জগৎ সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই। এক প্রলংকরী জলোচ্ছ্বাস তার বুকের মাঝ থেকে সবাইকে কেড়ে নিয়ে গেছে।

রাশেদ রফিক চাচার ঘরে নক করার পরিবর্তে সে আবার ভেড়িবাঁধের উপর উঠে এলো। তার মনে হলো — সে তো সত্যিকার অপরাধী হয়। অপরাধী তারাই যারা মিথ্যা বদনাম রটিয়েছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের জন্যও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। বর্তমানকালে এজন্য মানহানির কেস করা যায়। কিন্তু কেস করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল না। যেই দেশের জমিদারদের সাতখুন মাফ ছিল সেই দেশে জমিদার-জোৎদারদের বিরুদ্ধে মানহানির কেস করে কি হবে! তবু রাশেদ ঠিক করল সে আলমগীরের কাছে যাবে। তাকে শুধু একটি প্রশ্ন করবে — তার বিরুদ্ধে এই যে অপপ্রচার এর আসল উদ্দেশ্যটা কি? আলমগীর যদি রাশেদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি লিখে নিতে চায় তবে আজ রাতেই সে আলমগীরকে সবকিছু লিখে দিবে। বিনিময়ে শুধু বলবে — রাশেদের বিরুদ্ধে যে দুর্নাম রটানো হয়েছে সেটা মিথ্যা।

রাশেদ এক পা দুই পা করে আলমগীরের প্রমোদভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। চরকলমী বাজার থেকে সামান্য দূরে ভেড়িবাঁধের কাছাকাছি এক নির্জন স্থানে আলমগীরের প্রমোদভবন। নবাবদের বাগান বাড়ির মত ফুলগাছ ফলগাছ ঘেরা এ বাড়ি। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের সাময়িকভাবে থাকার জন্য যে ডাকবাংলো নির্মিত হয়, এই বাড়িটাও অনেকটা সে রকম।

রাশেদ এক রকম বিনা বাঁধায় ভবনের অভ্যন্তরে চলে গেল। দুইজন দারোয়ান গেটের কাছে লাঠি হাতে বসে আছে। দু'জনই মদ খাওয়া মাতালের মত বসে বসে ঝিমুচ্ছে। রাশেদকে ঢুকতে দেখে একজন বলল : কেডা খচ খচ করে রে? কেডা? দ্বিতীয়জন বলল: শিয়াল যায়, শিয়াল। বুঝলে শিয়াল! হা-হা-হা।

বারান্দায় পা রাখতেই একটি মেয়ের আর্তস্বর তার কানে এলো। রাশেদ সম্মুখে এগুনো বন্ধ করে বিষয়টি আঁচ করার চেষ্টা করলো। তার মনে হল — বাঘের থাবা থেকে আত্ম

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য একজন মানুষ যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে, তেমনি একটি মেয়ে আলমগীরের পৈশাচিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে। কিন্তু আদৌ কি পারবে সে নিজেকে রক্ষা করতে?

রাশেদের যতটা অনুমান রাত এখন শেষের দিকে। হয়ত আর দু'আড়াই ঘণ্টা পরেই মুয়াজ্জিনের আজান শোনা যাবে। অথচ এই শেষ রাতে এখানে মেয়ে এলো কোত্থেকে? ইংরেজ আমলের জমিদারদের মত আলমগীরের ভোগের জন্য তার লোকরা যদি কোন মেয়েকে ধরে এনেই থাকে সে তো আনার কথা সন্ধ্যা রাতেই। আর একটি নরপশুর হাতে একটি মেয়ের শ্লিলতা হানি হতে তো এতটা সময় লাগার কথা নয়।

রাশেদ নিঃশব্দে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বিষয়টা নিজ চোখে দেখার চেষ্টা করলো। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে — ভিতরের একটি কক্ষে আলো জ্বলছে। সে ঘরে কাত হয়ে পড়ে আছে একটি মদের বোতল। আলমগীর মাতাল অবস্থায় পাশের রুমের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। সে বন্ধ কক্ষ থেকে একটি মেয়ে বারবার বলার চেষ্টা করছে — আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার পায়ে পড়ি। দরকার হয় আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন। আমি আপনাকে বিয়ে করব। তবু দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন ইত্যাদি।

রাশেদ এ অবস্থায় কী করতে পারে? সে কি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যাবে? নাকি অসহায় মেয়েটিকে একটা নরখাদকের হাত থেকে উদ্ধার করবে?

রাশেদ এসেছিল আলমগীরের সাথে একটি ফয়সালা করতে। সে চেয়েছিল আলমগীর তার উপর আরোপিত অপবাদ প্রত্যাহার করে নিক। বিনিময়ে সে সমস্ত সম্পত্তি আলমগীরকে লিখে দিবে। অথচ এখানকার পরিস্থিতি দেখে তার ধারণা পাল্টে গেল। তার মনে হল —একজন মদ্যপের সাথে কোন বিষয়েই ফয়সালায় আসা যায় না। তার কাছে নিজের ইজ্জত ভিক্ষা চাওয়া মানে প্রকারান্তরে অন্যায় কাজে আরো উৎসাহিত করা। অন্যায়কারীদের সম্মুখে কেউ সাহস করে দাঁড়াতে চায় না। একবার দাঁড়াতে পারলে তাদের ধ্বংস অবধারিত। কারণ, সত্য চিরকাল মাথা উঁচু করে থাকে। আর অসত্য একদিন পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায়। অন্যায় অসত্য অত্যাচার কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না।

আলমগীর বন্ধ দরজায় আবার ধাক্কা দিচ্ছে। বলছে : এই, আমার হাতে ছুরি দেখছিস, তাড়াতাড়ি দরজা খোল, নতুবা এটা দিয়ে তোকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো। মেয়েটা বারবার বলছে — ভাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন।

: তোকে তুলে আনতে আমার কত সময়, কত অর্থ খরচ হয়েছে জানিস?

: আমি আপনার সব টাকা দিয়ে দিব, তবু আমাকে ছেড়ে দিন।

: দরকার হয় আমি তোকে দিনের পর দিন উপোষ করে রাখব। তবু আমার হাতে তোকে ধরা দিতেই হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ধরা দিতেই হবে। তোর মত কত দেমাগী মেয়েকে দেখলাম। দু'দিন আটকে রাখলে সব সোজা হয়ে যায়। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না। আঙ্গুল একটু বাঁকা করতে হয়। বাঁকা, বুঝলি, একটু বাঁকা। হা-হা-হা।

www.pathagar.com

রাশেদ ধীর পায়ে গিয়ে ঘুমন্ত একজন দারোয়ানের হাত থেকে একটি লাঠি নিয়ে এলো। সব সময় নিজের আত্মরক্ষার অবলম্বন হাতের কাছে রাখা ভাল। আলমগীরের হাতে ধারালো ছোরা, দ্বিতীয়ত সে মাতাল। বলা তো যায় না যদি এ অবস্থায় রাশেদের দিকে ছোরা নিয়ে ধেয়ে আসে? রাশেদ লাঠি এনেই দরজায় আঘাত করল। খুলতে দেরি দেখে সে দরজার উপর কষে এক লাথি মারলো। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল।

সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে দ্রুত গতিতে আলমগীর রাশেদের দিকে ছোরা উড়িয়ে মারলো। হঠাৎ কোন আক্রমণের জন্য রাশেদ মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে ছোরাটি উড়ে এসে তার বাম উরুতে লেগে গেল। রাশেদও আর সেদিকে না তাকিয়ে তার হাতের লাঠি দিয়ে আলমগীরের মাথায় সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলো। সাথে সাথে আলমগীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর তার বাম উরু থেকে ছোরা ছুটিয়ে সজোরে আলমগীরের বুকের উপর মারলো। দেখতে দেখতে দারোয়ান দু'জন দৌঁড়ে এলো। রাশেদ বলল : খবরদার, এদিকে এগুবে না। এগুলে এই পৃথিবী থেকে আজই চিরবিদায় করে দিব। দারোয়ান দু'জন ভয়ে পিছনে সরে গেল। ততক্ষণে মেয়েটি দরজার ওপাশ থেকে বলছে — ভাই কি হচ্ছে? দরজা খুলুন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রাশেদ খেয়াল করে দেখলো —রুমের উপরে নিচে শিকল দেয়া। মদ্যপটি লক্ষ্যই করেনি যে, মেয়েটির সমূহ ক্ষতি করার চাবি-কাঠি তার হাতেই ছিল। কেবল শিকল খুললেই মেয়েটিকে হাতের কাছে পেয়ে যেতো। এজন্যই বোধ হয় মেয়েটি বারবার বলছিল — আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। দরকার হয়ে আপনাকে আমি বিয়ে করব। কার্যতঃ তার আর প্রয়োজন হলো না। বিধাতা স্বয়ং যদি একজন মানুষকে রক্ষা করেন তবে কার সাধ্য কেউ তার ক্ষতি করে!

শিকল খুলে দিতেই মেয়েটি বেরিয়ে এসে বলল –

: রাশেদ ভাইয়া, আপনি!

: তুমি কে? তোমাকে তো চিনলাম না।

: আমি আহমদুল্লা মৌলবীর নাতনী খালেদা, গত সন্ধ্যায় পুকুর ঘাটে একা পেয়ে আলমগীরের লোকজন আমাকে ধরে নিয়ে আসে।

: ব্যাস, এইটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু শুনার কোন আগ্রহ আমার নেই। তুমি যাও। সোজা বাড়ি চলে যাও। আজ থেকে এই গ্রামে আর একটি অন্যায়ও হবে না। সকল অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

রাশেদ হাতের রশি দিয়ে দারোয়ান দু'জনকে শক্ত করে বাঁধলো এবং খালেদাকে নিয়ে ভেড়িবাঁধের দিকে চলে গেল।

রাশেদ ঠিক করল — যে পথ দিয়ে সে চিরবিদায় নিয়ে চলে এসেছে, সেই পথে আর কোন দিন যাবে না। সে খালেদাকে বিদায় দিয়ে উল্টো দিকে একপা দু'পা করে হাঁটতে শুরু করলো। কতদূর যেতেই তার মনে হল ভেড়ির উপর দিয়ে নয়, এর উপর দিয়ে যেতে থাকলে লোকজন তাকে ফলো করবে। তার ভিন্ন পথ ধরা প্রয়োজন। সে ভেড়িবাঁধ থেকে নেমে যুগির ঘোলের পাশ দিয়ে কচুখালির দিকে হাঁটতে শুরু করলো। সহসা সে গুদারা ঘাট সংলগ্ন কালিগাছ তলায় চলে এলো। ছোটকালের স্মৃতিবিজড়িত গুদারা ঘাট, সম্মুখে লেংডিয়ার বিল। সে এবার দ্রুত পায়ে বিলের পথে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

রাশেদ রাত নিশীথে ঘর ছেড়েছিল আত্মহত্যা করার জন্য। অথচ কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল মানুষ খুন করতে । এই জীবনে রাশেদ এতবড় পাপের কাজ করবে এটা সে কোনদিন ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি। পরন্তু ভাবতো কোনভাবে যদি এদেশের অসহায় মানুষের সামান্য উপকার করা যায়! আইনের নিষ্ঠুর রক্তচক্ষু দেখিয়ে কালে কালে এদেশের মানুষকে বন্দিখাঁচায় আটকে রাখা হয়েছিল। কখনো তাদের জানতেও দেয়া হয়নি কি তাদের অধিকার। কোনটা তাদের পাওনা। তার স্বপ্ন ছিল একদিন সে বড় হবে। সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। আইনের ভয়াবহ প্রয়োগ করে নয়, বরং আইনের ফাঁক দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে দেয়াই হবে তার প্রধান কাজ। কারণ আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের মুক্তির জন্যই আইন। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই আইনের কাজ। মানুষের পায়ে অন্যায়ভাবে শিকল পরানো নয়।

তার সকল স্বপ্ন, সব আশা আজ ধূলায় মিশে গেছে। আজ সে অপরাধী। মানুষ খুনের মামলা রুজু হবে তার বিরুদ্ধে। হোক মামলা, হোক কেস, এজন্য সে আজ আর ভীত নয়। সে তো মৃত্যুপথ যাত্রী। মৃত্যুর আগে কেবল একজন অত্যাচারীকে তার বিশাল পাপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছে। এজন্য তার কোন আফসোস নেই। হত্যাকাণ্ডের জন্য সকলে তাকে দায়ী করে করুক, পুলিশ তাকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াবে, বেড়াক। আইন তাকে অপরাধী বানালেও চরকলমীর শোষিত, নির্যাতিত ক'জন লোক তার কথা স্মরণ করবে, তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবে।

এই জীবনে সে কোন অন্যায় করেনি। তবু সব সময় অন্যায়ের শিকার হয়েছে । আজ সে একটি অন্যায় করল। এটি করার পর নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ মনে হচ্ছে। মনে হয় এই জীবনে সে একটি ভাল কাজ করল। যে কাজের জন্য চরকলমীর মানুষ তাকে অনেকদিন মনে রাখবে। প্রতিটি মানুষের উচিত এই জীবনে একটি ভাল কাজ করে যাওয়া। রাশেদের মনে হল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি তার করা হয়ে গেছে। এজন্য যেকোন মুহূর্তে সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ভাঙ্গা সাঁকোর কাছে চলে এসেছে। তার মনে হলো এটা সেই সাঁকো যার উপর সাদা কাপড় পরিহিত এক বুড়ি দাঁড়িয়েছিল। আজ তেমন কাউকে দেখা গেল না। বাড়ি ফেরার রাতে রাশেদ সেই বুড়ির কাপড় নড়তে দেখে ভয় পেয়েছিল। আজ ভয়ের কিছু নাই।

এই সেই লেংডিয়ার বিল যার মাঝ পথ দিয়ে একরাতে সে চলকলমী এসেছিল। সামান্য কয়দিনের ব্যবধানে সে আবার রাতের অন্ধকারে সেই পথ দিয়েই ফিরে চলছে। কোথায় সে যাচ্ছে? কোন স্থানে তার যাত্রা বিরতি হবে? কিছুই তার জানা নেই।

সহসা সে সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো — দিগন্ত আলোকিত করে শ্বেতশুভ্র কাপড় পরিহিত বিশাল আকৃতি নিয়ে মহিলা মত কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক জঙ্গইলা ভিটায় যে দাঁড়িয়েছিল, এখানেও ঠিক সেই দাঁড়িয়ে আছে। তার পা মাটিতে হলেও মাথা আকাশে। রাশেদ মনে মনে উপহাসের হাসি হাসলো। বললো— আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি! একজন মৃত্যু পথযাত্রী কখনই ভয় না। সে দ্বিগুন বেগে হাঁটতে শুরু করলো। হঠাৎ সমস্ত

www.pathagar.com

বিল খাল কাঁপিয়ে মহিলাকন্ঠী দেবদূত বাজখাঁই শব্দ করে বলে উঠলো —'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ .....'

কন্ঠস্বর শুনেই রাশেদ হতচকিয়ে গেল। তার মনে হল আজ এই লেংডিয়ার বিলে আত্মহত্যাকারী কোন বুড়ীর পাষাণ প্রেতাত্মা নয়। বরং স্বয়ং ইয়ানূর তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এতক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে রাশেদের সমস্ত কর্মকান্ড অবলোকন করেছে। শেষ মুহূর্তে জানিয়ে দিল রাশেদ পথ হারিয়েছে। এই জীবনে তার সাথে ইয়ানূরের আর কোনদিন দেখা হবে না। রাশেদ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com